তারুণ্যের
দুই রূপ
পৃষ্ঠা ৩

একটি ফাঁসির অপেক্ষায় পৃষ্ঠা ৮

ছাতিম
তলার
গান
পৃষ্ঠা ৪

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব
বিশেষ প্রকাশনা
শুক্রবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

www.ctgpressclub.com

সংহতি

তারুণ্যের জয়গানে জাতি একাকার

আলহাজ আলী আব্বাস

সভাপতি, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পথ ধরে হাঁটছে তরুণসমাজ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নের বাংলা দীর্ঘদিন ছিল বিবর্ণ। আজ যেন আবার জেগে উঠছে পুরো জাতি। বর্ণময় আলোকচ্ছটায় জেগেছে নতুন আবহ। যেন ফিরে যাচ্ছি '৭১ এর দিনগুলোতে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর একটি ডাক 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'-সাত কোটি
এরপর পৃষ্ঠা ৬

স্যালুট তারুণ্যের জাগরণ

মহসিন চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

স্যালুট প্রজন্ম। '৭১ এ গর্জন পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে। নতুন করে আরেক গর্জন ২০১৩-এ এসে। এবার তাদের এ দেশীয় দোসর, মানবতাবিরোধী অপরাধী রাজাকারদের বিরুদ্ধে। ঘৃণা-ক্ষোভ আর দেশপ্রেমবোধে মুষ্টিবদ্ধ হাত তরুণদের। গণজাগরণ, গণজোয়ার। কোনো রাজনৈতিক আদর্শে নয়, নয় কোনো রাজনৈতিক প্রশ্রয়েও। আদর্শ দেশ মাতৃকা। জাগ্রত বিবেক। হায়নাদের সহযোগীদের প্রতি ঘৃণার অনল জ্বলছে। দেশজুড়ে জেগে উঠেছে তরুণসমাজ। তারা শুধু নিজেরা নয়, সারা জাতিকে জাগিয়ে তুলেছে। যেন নতুন প্রাণস্পন্দন হতাশগ্রস্ত একটি জাতিকে। যেমনটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
এরপর পৃষ্ঠা ৬

গণজাগরণের উত্তাল ঢেউ

শুকলাল দাশ

অর্থ সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

সারা দেশে একাত্তরের চেতনার উত্তাল ঢেউ জেগেছে। ফাগুনের আগুন জ্বলছে সারা দেশে। শাহবাগ নতুন প্রজন্ম চত্বর থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বর কিংবা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া রাজাকারমুক্ত দেশ গড়তে জেগে উঠেছে আমাদের নতুন প্রজন্ম। তাদের স্বাগত জানাই। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম জাতিকে আশাবাদী করেছে। যেকোনো মূল্যে এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। কাদের মোল্লার রায়ের পরপরই শাহবাগের রাস্তায় প্রতিবাদ জানায় কয়েকজন তরুণ। সময়ের স্রোতে তাদের দলে যোগ হয়ে গেল দেশের তরুণ প্রজন্ম। তাদের সুর ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব থেকে সবখানে, সারা দেশে।

মাঠে, রাস্তায়, ফেসবুকে, ব্লগে সব জায়গায় তরুণদের উত্থান দেখে মুগ্ধ এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ। তারুণ্য জেগেছে। সবাই স্বপ্ন দেখছে তারুণ্যের জোয়ারেই ধুয়ে মুছে যাবে বাংলার কলঙ্ক। দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিটি তরুণের হৃদয় আজ। এমন কোনো হৃৎপিণ্ড নেই যেখানে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে না রাজাকারের ফাঁসির দাবি। চাপা ক্রোধ আজ অনেক দিন পর রূপ নিয়েছে গণআন্দোলনে। প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষ একাত্তরের নরঘাতকদের বিরুদ্ধে আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। যারা নির্বিচারে হত্যা, খুন আর ধর্ষণ করেছিল ১৯৭১ সালে।

গত কয়েকদিন ধরে দেখলাম একজন ভ্যানগাড়িচালক প্রতিদিন বেলা ২টা বাজতে বাজতেই চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, হাততালি দেন, 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার' বলে। তার কাছে জানলাম প্রতিদিন একবার হলেও এখানে (চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের গণজাগরণমঞ্চে) হাজিরা দিয়া যামু', 'আমার সোনার বাংলায় রাজাকারের ঠাঁই নাই'।

অনেক দেরিতে হলেও স্বাধীনতার পরের প্রজন্ম আজ ৭১'এর রাজাকারমুক্ত দেশ গড়ার সংগ্রামের অংশীদার। এমন এক
এরপর পৃষ্ঠা ৬

কী অর্জন নিয়ে ঘরে ফিরবে তরুণ প্রজন্ম?

রফিকুল বাহার

নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ

আমার সাংবাদিকতার বয়স ২৩ বছর। আর আমার বয়স ৪৫। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার যা বয়স ছিল তাতে বেশি কিছু বোঝার ক্ষমতা ছিল না। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম। সে আন্দোলনের রূপ ছিল অন্যরকম। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। আওয়ামী লীগ-বিএনপি এই দুই প্রধান দল ছাড়াও অনেকেই এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ভাবা হয়েছিল, স্বৈরাচার হটলেই দেশে গণতন্ত্র ফিরবে। দুর্বল হবে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির চক্র। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন এরশাদ সরকারের পতনের পর আন্দোলনের এত কঠিন রূপ আর কেউ দেখেনি। ২০১৩ সালে রাজাকারবিরোধী এই গণজাগরণ দেখে মনে হয়েছে যে, এই বাংলাদেশে অন্যরকম এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে তরুণ প্রজন্ম। এরা কেউ সংগঠিত নয়, রাজনৈতিক দলের ব্যানারেও নেই এরা।

কম্পিউটারের ইন্টারনেটই এদের যোগাযোগ। এদের প্রত্যেকেই ছাত্র-ছাত্রী। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও কর্মী এরা। কিন্তু জামায়াতের নেতা কাদের
এরপর পৃষ্ঠা ৭

সম্পাদকীয়

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে...

আলমগীর সবুজ

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

কবি সুকান্তের মতো বাংলাদেশের তরুণরাও যেন দিনপঞ্জিকাই লিখছে এখন! সেই ৫২ সাল থেকে তরুণরা দেশের, জাতির কঠিন সময়ে মাঠে নামে। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সবখানেই ছিল তরুণের জয়গান। তরুণদের মুকুটে এবার যুক্ত হলো আরেক পালক। তারা শাহবাগ থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সর্বত্র এক ধ্বনি ছড়িয়ে দিয়েছে, মানবতাবিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধীদের ফাঁসি চাই! পুরো দেশজুড়ে আজ একটিই আওয়াজ-ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই!

শাহবাগের আগুন চট্টগ্রামে আসে ৬ ফেব্রুয়ারী। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিকাল তিনটায় কিছু তরুণ উদ্যোগীরা প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয়। বেছে নেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত এবং প্রগতিশীল মানুষের অন্যতম বিচরণক্ষেত্র চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বর। প্রথম দিনেই এখানে ব্যাপক সাড়া পড়ে। তরুণদের সাথে যোগ দেন সাধারণ নারী পুরুষ, পেশাজীবীরাও। একদিন যায়, দুই দিন, পার হয় ১০ দিন আন্দোলনে ভাটা পড়ে না। দিন দিন বাড়ে মানুষের স্বত:স্ফূর্ততাস্তচট্টগ্রামের সাংবাদিক সমাজ বিশেষ করে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রথমদিন থেকেই পাশে দাঁড়ায় এই আন্দোলনে। প্রেস ক্লাব মনে করে, মানবতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন তরুণরা শুরু করলেও এটা প্রগতিশীল এবং দেশপ্রেমিক সকল বাংলাদেশির মনের দাবি। তাই চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের দ্বিতীয় আবাসস্থল চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব এই দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করে। আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক সময়টাকে সংরক্ষণেরর উদ্যোগ নেয় প্রেস ক্লাব। কয়েকঘন্টার নোটিশে 'সংহতি' নামের এই বুলেটিন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সময় স্বল্পতার কারণে ক্লাবের সকল সদস্যকে লেখা প্রদানের জন্য বলার সুযোগও হয়নি। সেল ফোনে তারাহুড়া করে লেখা সংগ্রহ করে এই বুলেটিন প্রকাশ করা হলো। তাই ভুলত্রুটি থাকার খুবই স্বাভাবিক। অনচ্ছিাকৃত সব ভুলের জন্য ব্যবস্থাপানা কমিটির পক্ষে আমি ক্ষমা চাইছি। আর সব ধরণের লেখা সব লেখকের নিজস্ব চিন্তা থেকে লেখা। এখানে বানানের ভুল সংশোধন ছাড়া লেখা পরিবর্তনের ধৃষ্টতা দেখানো হয়নি। সুতারাং সব লেখার দায় লেখকের।

এই প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তা করেছেন ক্লাবের সদস্য ও দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ সম্পাদক রুশো মাহমুদ। তাঁকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের ফিচার সম্পাদক হোসাইন তৌফিক ইফতিখারকে। তিনি না হলে এই প্রকাশনা বের করা কঠিন হতো। এই প্রকাশনায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন রশীদ মামুন ও আল রাহমান। তাদেরও ধন্যবাদ জানাই।
ধন্যবাদ জানাই এই বুলেটিনের লেখকসহ সব কুশীলবকে।

ছড়া

শামসুদ্দিন হারুণ

ব্যুরো চিফ, সকালের খবর

১.
ঐ দেখো, ঐ যায় রাজাকার
ঘিন ঘিনে কদাকার হায়না,
মানুষের ঘিলু খেয়ে মজা পায়
আর তারে ছেড়ে দেয়া যায় না।

ঐ দেখো, ওৎ পেতে বসে আছে
রাজাকার-শকুনের শিষ্য,
শান্‌দার চেতনায় দিতে হবে ধার
তা না হলে হতে হবে নিঃস্ব।

ঐ দেখো, ঐখানে রাজাকার
গলা ছিলা শকুনের বাচ্চা,
টুঁটি চেপে ধর্ গিয়ে ব্যাটাদের
দেশ প্রেম হবে তবে সাচ্চা।

২.
ভোর বেলা হৈ চৈ-শোরগোল চিৎকার শোনা যায়
চেয়ে দেখি আঁধারেও আঙুল সব কটা গোনা যায়।

ঘুম ভাঙা চোখ নিয়ে-চট করে খুলে দেখি দর্‌জা
হৈ চৈ চলছেই, কিল ঘুষি পদাঘাত-ধর্ মার,সর্ যা।

গণ হারে মারপিট চলছে-এই ভাবে হচ্ছে যে সাজা কার?
এ যে দেখি সেই লোক-যেই ব্যাটা ছিলো এক রাজাকার।

সে কালের কিছু কাজ, এ কালেও ঘটছে-
তার পরও কিছু কথা এলোমেলো রটছে।

রাজাকারের ফাঁসি

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার

ব্যুরো চিফ, মানবকণ্ঠ

একাত্তরের ঘাতক তোরা পাকিস্তানের দালাল
তোদের জন্য কেমন করে এদেশ হবে হালাল।
হারামিতেই জন্ম তোদের রক্তে তোদের বিষ
দেশের খেয়ে করিস তোরা অন্যকে কুর্নিশ।

পাক হায়েনার সঙ্গে মিলে কী করিসনি একাত্তরে
খুন ধর্ষণ গুম করেছিস বধ্যভূমি দেশটা জুড়ে।
ভাই হারিয়ে বোন কেঁদেছে বোন হারিয়ে ভাই
পাড়ায় পাড়ায় আগুন দিয়ে দেশ করেছিস ছাই।

স্বজন হারার কান্না এখন পান্না হয়ে ঝরে
রাষ্ট্র যখন একাত্তরের খুনির বিচার করে।
সেই বিচারেও আসছে বাধা শত্রু তোলে ফণা
হারবে কী আজ দুঃখিনী মা হারবে বীরাঙ্গনা!

জামালখানে লক্ষ তরুণ কণ্ঠে তোলে সুর
তুই রাজাকার তুই রাজাকার দূর হয়ে যা দূর।
দেশজুড়ে সেই সুর যেন আজ হ্যামিলনের বাঁশি
একই কণ্ঠে একই আওয়াজ রাজাকারের ফাঁসি।

তারুণ্যগর্জনের আরেক বসন্ত

হাসান নাসির

সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ

মহিমান্বিত আরেক বসন্ত দীর্ঘ ছয় দশক পর। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবিতে ১৯৫২ সালে শোনা গিয়েছিল তারুণ্যের গর্জন। তখন ছিল বসন্ত। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আল বদরদের ফাঁসির দাবিতে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসে আবারো তারুণ্যের গর্জন। এবারো সেই বসন্ত। সাধারণত বড় নেতাদের আহবানে রাজপথে নেমে থাকে তরুণ-যুবকরা। আর এখন বড়রা সামিল হয়েছেন তরুণদের নেতৃত্বে। শাবাশ তারুণ্য-শাবাশ। 'তারুণ্যের অবক্ষয়' বলে যে অপবাদটি প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল তা তোমরা হতে দিলে না। বরং ক্ষমতার মোহে বিভোর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দেউলিয়াত্বের অন্ধগলি থেকে টেনে আনবার মহান দায়িত্বটুকু কাঁধে নিয়েছ। এই দ্রোহ যেন থেমে না যায়।

বাঙালির জাতীয় জীবনে প্রতি দুই দশক পর শোনা যায় তারুণ্যের মহাগর্জন। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের দুই দশক পর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এর দুই দশক পর নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান। সর্বশেষ ২০১৩ সালে আরেক জাগরণ। এটিও ঘটল দুই দশক পর। তবে মুক্তিযুদ্ধের বীজ মানে একুশ। কিছুই হতো না একুশ না হলে। দ্বিজাতি তত্ত্বে বিমোহিত পূর্ব বাংলার বাঙালিরা ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ গড়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল। সে মোহ কাটতে বেশি সময় লাগেনি। সর্ব প্রথম একুশই খোঁচা দিয়ে বলল, 'এই-ভুলে যাচ্ছো কেন, তোমরা তো বাঙালি। তেলে-জলে মিশ খায় না। তোমাদের সাথে ওদের সহবাস হতে পারে না। গর্জে ওঠো তারুণ্যের জয়গানে।' তরুণরা মাঝে মধ্যে নিশ্চুপ থেকেছে বটে, তবে অধঃপতিত হয়নি, যার প্রমাণ ফের এভাবে জেগে ওঠা। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বর হলো আরেক শাহবাগ। এগিয়ে যাও তারুণ্য। নেতারা এখন তোমাদের নেতৃত্বে। এই তো চাই। শাসক দলগুলোকে জানিয়ে দাও- 'ক্ষমতার জন্য, ভোটের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নে আর আপোস নয়। মানব না, সইব না।'

'...তবু মাথা নোয়াবার নয়'

মিন্টু চৌধুরী

সিনিয়র রিপোর্টার, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ধর্মই এমন। এখানে পলি মাটির বুকে আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে, আর পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়। মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে উৎসর্গ করেন মুক্তির জন্য। এখানে তরুণরা ভাষার দাবিতে রক্ত দেয়, যেন রক্তবীজ। বায়ান্ন থেকে উনসত্তর, একাত্তর, নব্বই হয়ে আবার ২০১৩।

বঙ্গোপসাগরের গর্জনের মতো ওই শোনা যায় তারুণ্যের জয়ধ্বনি। শাহবাগ থেকে চট্টগ্রামের জামালখান প্রেসক্লাব চত্বর, রাজশাহী থেকে শ্রীমঙ্গল। সব আজ প্রকম্পিত এক দাবিতে। ক্ষমতা, বন্দুকের নল, বিশ্ব শক্তির মেরুকরণ কিছুই থামাতে পারবে না এই জনজোয়ার। সব মিথ্যের ভীত কাঁপিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। তারুণ্যের শক্তি আর আত্মত্যাগে শুদ্ধ হবে এই যাত্রা।

৪৭-এ দেশভাগের পর 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান দেওয়া তরুণরাই ভাষার দাবিতে জেগে উঠেছিল। ৫২-তে রক্তের দামে কেনা হয় বাংলা। তারপর ৫৪-তে একধাপ এগিয়ে আবার সামরিক হায়েনার কবলে স্বদেশ ভূমি। যার যা বুঝে নেওয়ার তা বুঝে নিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল জলোচ্ছ্বাস, ৬৯ থেকে ৭১ এ ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ের মতো সব অন্যায়-অবিচার ধুয়ে মুছে সাফ হয়। নতুন সূর্যের সঙ্গে উদিত হয় নতুন দেশ-বাংলাদেশ। তবু ষড়যন্ত্র থামে না। উল্টো রথের যাত্রা শুরু হলে অন্তর্যামী ঈশ্বর মৃদু হাসেন। পুরনোরা স্থবির বুড়ো ব্যাঙের মতো কুয়োয় আটকে যান। নিজের ছায়া দেখেও

এরপর পৃষ্ঠা ৬

দেশ জেগেছে, জেগেছে চট্টগ্রামবাসী

সুজয় মহাজন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, প্রথম আলো

বীরের সূতিকাগার চট্টগ্রাম। দেশের যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামে জেগেছে এই চট্টগ্রাম। কখনো একা একা। আর কখনো জাতীয় কর্মসূচির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। সেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমানের তারুণ্যের নবযুদ্ধ। সবসময়ই সরব থেকেছে চট্টগ্রাম। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার রায়ের পর একদল তরুণ রাজধানীর শাহবাগে জড়ো হয়ে ডাক দিল নবযুদ্ধের। পরদিন থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একদল তরুণ তার সঙ্গে একত্ম হয়ে শরিক হলো এই যুদ্ধে। এর আগে তাৎক্ষণিকভাবেও রায়ের প্রতিবাদ জানানো হয়।

চট্টগ্রামের নবযুদ্ধের তরুণ সৈনিকদের বেশিরভাগই আবার চট্টগ্রামে সাংবাদিকতা ও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। সেই যে শুরু এরপর আর থামানো গেল না গণজাগরণ। রাজধানীর শাহবাগের মতো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনের সড়কটি এখন নবযুদ্ধের ময়দান। অস্ত্র নয়, কণ্ঠের অস্ত্রের বিস্ফোরণ কর্ণফুলীর গর্জন হয়ে ঝরছে প্রতিদিন।

শুরু থেকে সময় বেঁধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে চট্টগ্রামের এই আন্দোলন। ৯ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রামে জামায়াত দিল হরতালের ডাক। অনেকদিন পর জামায়াতের সেই হরতাল বয়কট করেছে চট্টগ্রামবাসী। এমনকি হরতালের দিন সকাল থেকেই সব ভুলে প্রেস ক্লাব চত্বর উত্তাল রাজাকারের ফাঁসির দাবিতে। শাহবাগের সুর, স্লোগান সব মিলেমিশে একাকার চট্টগ্রামের মাটিতেও। দেশ জেগেছে, জেগেছে চট্টগ্রামবাসী। একটি সংকল্প, একটিই দাবি-রাজাকারের ফাঁসি, ফাঁসি।

শাহবাগ থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

শিখা জ্বেলেছিল একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস!

হোসাইন তৌফিক ইফতিখার

ব্লগার ও সাংবাদিক

৫ ফেব্রুয়ারির ছোট একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দুদিন পর শাহবাগে এসে এখন জাগিয়ে তুলেছে পুরো বাংলাদেশকেই। ঢাকার প্রজন্ম চত্বর থেকে চট্টগ্রামের প্রেস ক্লাব, জামালখান-সবখানে অবিকল সেই একই কণ্ঠ, সেই একই জনস্রোত, সেই একই স্লোগান-'রাজাকারের ফাঁসি চাই'।

যুদ্ধাপরাধী আবুল কালাম আজাদের পর কাদের মোল্লারও ফাঁসি হবে-এমনটিই ধরে নিয়েছিলেন অন্য অনেকের মতো ইন্টারনেটভিত্তিক ব্লগাররাও। অনলাইনে মন্তব্য ও লেখায় সেই ক্ষণটি উদযাপনের প্রস্তুতি ছিল সবার। কিন্তু কাদের মোল্লার অপ্রত্যাশিত যাবজ্জীবন উদযাপনের আনন্দ ম্লান করে হতাশায় ডুবিয়ে দেয় তাদের। সেই হতাশা দ্রুতই অনূদিত হয় ক্ষোভে। আর সেই ক্ষোভ অনলাইন থেকে ছড়িয়ে পড়ে অফলাইনে। ৫ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে তিনটায় পোস্ট করা সেই স্ট্যাটাসে (www.facebook.com/events/500274583347447) লেখা হয়- 'কাদের মোল্লার মতো একজন কুখ্যাত খুনি যদি যাবজ্জীবন পায়, তাহলে এই রায়ের অর্থ কি? আমরা এই রায় মানি না। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় যতদিন না হচ্ছে, আমরা রাজপথ ছাড়বো না। চলে আসুন প্রতিদিন সকাল ৮টায়, প্রজন্ম চত্বরে (শাহবাগে)। একটাই দাবি, কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই। সারা দেশের তরুণ, যুবক, নারী, বৃদ্ধ মায় আপামর জনতাকে আহ্বান করছি, স্লোগান হবে দ্রোহের, বিপ্লব হবে অভূতপূর্ব। এ লড়াই বাঁচার লড়াই,/ এ লড়াই জিততে হবে/ দাবি মোদের একটাই/ রাজাকারের ফাঁসি চাই...।'

আন্দোলন শুরুর তিন দিন পর শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক মুন্সী আমাকে জানান, 'শুরুতে পরিচিতজনদেরও অনেকে ভয় দেখিয়েছিলেন, আদালতের রায় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করা ঠিক হবে না। ঝামেলা হতে পারে। কিন্তু আমাদের মন মানছিল না কিছুতেই। জঘণ্য সব অপরাধ করেও কাদের মোল্লার মতো একজন চিহ্নিত অপরাধী ফাঁসির দণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে যাবে-এটা আমাদের কল্পনায়ও ছিল না। আমরা যারা অনলাইনে সক্রিয়, তারা ওই রায়ের পর কিছু একটা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠি। শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন ব্লগারের সঙ্গে পরামর্শ করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেই।'

তিনি বলেন, 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ১২ হাজার ফেসবুকার আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মতি জানান। সংহতি জানিয়ে ওই এক স্ট্যাটাস মুহূর্তেই শেয়ার হয় আরো অসংখ্য ফেসবুক অ্যাকাউন্টের দেয়ালে। এরপর আমরা দ্রুত ব্যানার তৈরি করার কাজে নেমে পড়ি। বিকেলেই সেই ব্যানার নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে যাই শাহবাগে।'

মাহমুদুল হক মুন্সী বলেন, 'তখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরো বড়ো বিস্ময়। শাহবাগে আমাদের প্রতিবাদী সমাবেশ শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সঙ্গে সংহতি জানাতে আসেন প্রচুর মানুষ। বেলা যতো বাড়তে থাকে, মানুষের সংখ্যাও বাড়ছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সেই অনুভূতি বোঝানো যাবে না কোনোভাবেই।'

চট্টগ্রামের জামালখানও এখন হয়ে উঠেছে শাহবাগের প্রতিচ্ছায়া। কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে আয়োজিত গণজমায়েতে যোগ দিচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, সাধারণ মানুষ সবাই। নগরীর জামালখান কেন্দ্রিক এই গণজমায়েতের অন্যতম উদ্যোক্তা শওকত বাঙালি শুরুর দিককার কথা বলতে গিয়ে জানান, 'ফেসবুকেই আমরা প্রথম জানতে পারি ঢাকার শাহবাগে ব্লগার ও অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের একটি সমাবেশ হতে যাচ্ছে শাহবাগে। কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে আমরা নিজেরাও কিছু একটা করার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছিলাম।

তবে ফেসবুকে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ দেখেও আমরা বুঝতে পারিনি, শাহবাগের ছোট্ট সেই জমায়েত গণমানুষের অমন গণজাগরণে পরিণত হবে। চট্টগ্রামের জামালখানের সমাবেশেও শুরুতে আমাদের ধারণা ছিল না, সাধারণ মানুষ এভাবে এগিয়ে আসবে, মুখর হবে প্রতিবাদে। সত্যি বলতে কী, জামালখানে প্রতিদিনের প্রতিবাদী জমায়েতে জড়ো হচ্ছেন যারা, তাদের প্রায় সবাই রাজনীতিবিমুখ। প্রচলিত রাজনীতির প্রতি তাদের আস্থা নেই। কিন্তু এরাই এই আন্দোলনের মূল শক্তি।'

তারুণ্যের দুই রূপ

নাসির উদ্দিন হায়দার

যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, সুপ্রভাত বাংলাদেশ

এখন, এই সময়ে তারুণ্যের দুই রূপ দেখছি আমরা। কবি হেলাল হাফিজের কবিতার মতোই, 'এখন যৌবন যার/ যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।'

হ্যাঁ, এখন তরুণেরা যুদ্ধই করছে, একদল আছে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে, জামালখানের গণজাগরণ মঞ্চে। তাদের যুদ্ধ একাত্তরের পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে। তাদের যুদ্ধ সত্য, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। আরেক দল আছে রাজপথে, তাদের যুদ্ধ মৌলবাদ, ফ্যাসিবাদের পক্ষে, ধর্মের সোল এজেন্ট হিসেবে পরিচিত জামায়াত-শিবিরের প্রাণের দোসর একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বাঁচাবার জন্য। তাদের যুদ্ধ খুনি, ধর্ষকদের বিচার ঠেকানো।

দুই যুদ্ধর দুই ফল দেখা যাচ্ছে।

এক. শাহবাগের আগুন ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে, সারা বিশ্বে। আজ আকাশে-বাতাসে একটিই দাবি 'কাদের মোল্লাসহ সব রাজাকারের ফাঁসি।' একটি জাতির মুক্তির যুদ্ধে বিরোধিতাকারী নরঘাতকদের যৌক্তিক শাস্তির দাবিতে এমন গণবিস্ফোরণ অভূতপূর্ব। সুসংগঠিত কোনো নেতৃত্ব ছাড়াই ১০ দিন ধরে (১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) লাখো মানুষের গণসমাবেশে কোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়াই চলছে, বাঙালির স্বভাব চিন্তা করলে এও অভূতপূর্ব এবং অকল্পনীয়। কথায় আছে পাঁচজন বাঙালি এক জায়গায় হলে সেখানে তিনটি গ্রুপ হয়। কিন্তু শাহবাগের আয়োজনের পেছনে রয়েছেন কিছু অগ্রসর চিন্তার তরুণ। বলতে গেলে তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে গোটা জাতি। একাত্তরের আবেগ বুকে ধারণ করে তারুণ্যের যে প্রতিবাদ তার ফল অবশ্যই শুভ হবে।

দুই. জামায়াত-শিবিরের পতাকাতলে একত্রিত হয়ে আজ যেসব তরুণ রাজপথে আগুন জ্বালাচ্ছে, এর ফলে কী হচ্ছে? এককথায় দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে তারা, নিজেরাও মরছে, মারছে সাধারণ মানুষ। এখন শিবিরের সহিসতায় শামিল হচ্ছে যে তরুণ, একাত্তর সালে তাদের জন্মও হয়নি। তারা কেন একাত্তরের নরঘাতকদের জন্য প্রাণপাত করছে? অন্যের অন্যায়ের দায় নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে? মগজধোলাই আর কারে বলে!

শেষ কথা হচ্ছে, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি জিতবে না সত্য? অবশ্যই জিতবে। তবে সে জয়টা যেন শুধু রাজাকারের ফাঁসির ইস্যুতে শেষ হয়ে না যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি, দুঃশাসন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

রাজাকারের ফাঁসির পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কি জাগবে না তারুণ্য! বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কি লড়বে না তারুণ্য?

ওরাই হারম্যান কিংবা ফ্রাংক

৪২ বছর পর 'দিন বদলাইছে'

জামসেদ রেহমান চৌধুরী

সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর

১৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার। সন্ধ্যা সাতটা। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি ও সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদি দল জামায়াত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে উত্তাল চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরের গণজাগরণ মঞ্চ। কাদের মোল্লা, নিজামী, গোলাম আজমের প্রতীকী ফাঁসি দেখছিলাম। পাশেই দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ কাঁধে ঠোকা দিলেন। তার দিকে ফিরতেই বললেন 'হারা জীবন আকাম কুকামের ফল শেষ বয়সে এত্ত অপমান, হেগো লজ্জা লাগে না, সয় ক্যামনে, হালারা বিষ খায়া মরে না ক্যা।' বলেই যুদ্ধাপরাধীদের ব্যঙ্গচিত্রে একদলা থু থু ছুড়লেন।

বৃদ্ধের কথা শুনে মনে পড়ে গেল জার্মানির নাৎসি যুদ্ধাপরাধী গ্যুরিং হারম্যানের কথা। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে (১৯৪৫-১৯৪৯) যার ফাঁসির দণ্ডাদেশ হয়েছিল। হারম্যান ছিলেন হিটলারের 'ফোর ইয়ার প্ল্যান'র পরিচালক এবং তৎকালীন জার্মান এয়ারফোর্সের প্রধান।

ফাঁসির রায় কার্যকরের ঠিক আগের দিন সায়ানাইড পিল খেয়ে কারাগারের ভেতর আত্মহত্যা করেন হারম্যান।

সুইসাইড নোটে লিখে যান-'I would have no objection to getting shoot.but hanging is inappropriate for a man of my position. (গুলি করে মারলে আমার কোনো আপত্তি থাকত না, কিন্তু ফাঁসিতে ঝুলে মরা আমার মতো পদমর্যাদা সম্পন্ন লোকের জন্য সম্মানজনক নয়)।

গণজাগরণ মঞ্চে সংহতি জানাতে আসা ওই বৃদ্ধকে বলা হয়নি, গোলাম আজম বা নিজামী তো আর হারম্যান নন।

পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের আবার অপমানবোধ! সেটা থাকলে ওদের তো বাংলাদেশেই থাকার কথা না। তবে শেষ রক্ষা কারোরই হয়নি। এর জ্বলন্ত উদাহরণ ফ্রাংক হ্যানস, যিনি ছিলেন নাৎসি বাহিনীর গভর্নর জেনারেল। তার সব দাপট, অহংকার চূর্ণ হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর, ফাঁসির কাষ্টে ঝুলে।

বাংলাদেশের গোলাম আজম, নিজামী, মুজাহিদরাই একেকজন হারম্যান কিংবা ফ্রাংক। এবার একাত্তরের এসব যুদ্ধাপরাধীদের প্রায়শ্চিত্ত করার পালা। একাত্তর দেখিনি, আর আফসোস নেই, ২০১৩ দেখেছি।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের মতো অসাধারণ ব্যক্তির ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে যে তারুণ্য ব্লগ ফেসবুক ছেড়ে রাজপথে গর্জে উঠেছে ইস্পাতকঠিন শপথ নিয়ে, তাদের রুখবে সাধ্য কার। কবি শামসুর রাহমান বেঁচে থাকলে আর লিখতে পারতেন না- 'উদ্ভট উঠের পিঠে চলেছে স্বদেশ'! ৪২ বছর পর 'দিন বদলাইছে।'...

গণজাগরণ

ঐক্য থাকুক অটুট

রিয়াজ হায়দার

সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন

শুরু থেকেই যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবির 'গণজাগরণ' মঞ্চের নেপথ্যে এক ঐতিহ্যিক দায়িত্ব নিয়েছে চট্টগ্রামের পেশাদার সাংবাদিকদের প্রাচীন ও বৃহত্তম সংগঠন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে)। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে সর্ব মানবের এই সম্মিলনে নিঃসন্দেহে প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষের উদার নৈতিক সহযোগিতা ও চৈতন্যের দায়বোধ আমাদের কৃতজ্ঞ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মতোই এই গণজাগরণমঞ্চ ঘিরেও কিছু বিভ্রান্তির ডালপালা গজিয়েছে শুরু থেকেই। এর সাথে জড়িত? রোজ রোজ এত মানুষ কেন, কীভাবে? নেপথ্যে কি অন্য কেউ, কোনো রাজনীতি জড়িত? আবার একক কৃতিত্ব নেবার প্রবণতা লক্ষণীয় কারো কারো মাঝে। মুক্তিসংগ্রাম যেমন একদিনে চূড়ান্ত রূপ পায়নি তেমনি এমন গণজাগরণও পাখা মেলেনি মুহূর্তেই। শহীদজননী জাহানার ইমামের দেখিয়ে দেওয়া বৃহৎ আন্দোলনের পথ ধরে ৯২-এর 'গণআদালতে' শপথ নেওয়া রক্তের উত্তরাধিকার বেয়েই একদিকে মহাজোট সরকারের প্রতিশ্রুত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারপ্রক্রিয়া, অন্যদিকে ব্লগারসহ মুক্তিযুদ্ধের উত্তর প্রজন্মের নানা শক্তির সচেতন তৎপরতা ক্রমে বীজবুনে এই গণজাগরণমঞ্চের। যার ফলশ্রুতিতেই ঘাতক কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় না হয়ে যাবজ্জীবন রায়ে চেতনার বাঁধভাঙা জোয়ার প্রথমেই ব্লগারদের হাত ধরে নেমে আসে শাহবাগে। সেদিনই চট্টগ্রামে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন সমাবেশ শেষে শহীদমিনারে গিয়ে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ (চট্টগ্রামের সব পেশাজীবী সাংস্কৃতিক সংগঠনের বড় মোর্চা) সভাপতি প্রফেসর ডা. একিউএম সিরাজুল ইসলামের সিইউজে ও সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি ও সংগঠক মফিজুর রহমান, অনুপ সাহা, আবৃত্তিকার রাশেদ হাসান, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমন্বয়কারী শওকত বাঙালি, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী তরুণ উদ্যোগের আহ্বায়ক শরীফ জাহানসহ কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিই পরদিন থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনের সংগঠনভিত্তিক ক্রমান্বয় গণঅবস্থানের। সম্পূর্ণ নির্দলীয়, সার্বজনীন চেতনার এ উদ্যোগ শেষপর্যন্ত সবার যোগেই জয়যুক্ত হয়ে তরুণের গণজাগরণমঞ্চেও। এ ক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে সিইউজে সভাপতি শহীদ উল আলম এবং প্রেস ক্লাব সভাপতি আলহাজ আলী আব্বাস, সাধারণ সম্পাদক মহসিন চৌধুরীর উদার সহযোগিতা ও সমর্থন এ উদ্যোগকে নিঃসন্দেহে গতি দিয়েছে।

এ গণজাগরণ প্রস্তুতি সভাগুলোতে মঞ্চের পরামর্শক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সহসভাপতি মোশতাক আহমেদ, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আবু সুফিয়ান। এ ছাড়াও একাধিক বৈঠকে ছিলেন সিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নির্মলচন্দ্র দাশ ও নাজিমুদ্দিন শ্যামল, প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কলিম সরওয়ার, সিইউজের সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক তাহের, সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস, রমেন দাশগুপ্ত, মিন্টু চৌধুরী, অনিন্দ্য টিটো, মিঠুন চৌধুরী প্রমুখ। গণজাগরণমঞ্চের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোদ্ধাদের অবদান অতুলনীয়। পেশাদারিত্বের পাশাপাশি আমাদের কার্যক্রম নানাভাবে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়েছেন বিএফইউজের যুগ্ম মহাসচিব আসিফ সিরাজ, প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি রাশেদ রউফ, সহসভাপতি কাজী আবুল মনসুর, সাংবাদিক ও সংগঠক মাঈনুদ্দীন দুলাল, তরুণ সাংবাদিক রশীদ মামুন, শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, তরুণ সাংবাদিক নেতা আলমগীর সবুজ, আজাদ তালুকদার, অনুরূপ টিটু, জোবায়ের হোসাইন সিকদার, হাজেরা শিউলি, ঋত্বিক নয়ন, ইফতেখারুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম, রেজা মুজাম্মেল, পূরবী দাশ, পিংকী চৌধুরী, রক্তিম দাশ প্রমুখ। সাংবাদিকতার বাইরে থেকে সর্বজনীন এ উদ্যোগে যে কজনের নাম না বললেই নয়, তারা হলেন নারীনেত্রী নুরজাহান খান, কমরেড শাহ আলম, শিক্ষকনেতা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কমরেড অশোক সাহা, প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, শিক্ষক নেতা অঞ্জল চৌধুরী, আবৃত্তি সংগঠক পঞ্চানন চৌধুরী, ডা. চন্দন দাশ, মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান মাকসুদ আহমেদ, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের মধ্যে শাহজাহান চৌধুরী, এমআর আজিম, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, শওকত হোসাইন, আবুল হোসেন আবু, মোরশেদুল আলম বাচ্চু, হাবিবুর রহমান তারেক, সংস্কৃতিকর্মী অনুপ বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা বড়ুয়া, প্রণব চৌধুরী, মামুরা মমতাজ দীপা, রূপা দত্ত, তৈয়বা জহির আরশি প্রমুখ। আমরা একক নয়, বহু এবং অভিন্ন এমন চেতনার '৭১ এ অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের দায়বোধ থেকে বাকি কাজ সমাপ্ত করতে এই প্রজন্মের আরেক মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান জানাতেই অন্যসব শ্রেণীর মানুষের মতো প্রত্যয়দীপ্ত দৃপ্ত আমরা। আমাদের ঐক্যই এই সংগ্রামকে সফল করবে একাত্তরের মতোই। তবেই শুরু হতে পারে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার মহাসড়কে রক্তিম পথচলা।

ছাতিম তলার গান

ওমর কায়সার

সহকারী বার্তা সম্পাদক, প্রথম আলো

রাত বাড়ে না জামালখানের
স্লোগানমুখর ছাতিম তলায়
হাত ধরেছি, জোট বেঁধেছি
গান ধরেছি ভাঙা গলায়।

সূর্য বুঝি ডুববে না আর
শাহবাগের ওই পথের মোড়ে
ময়লাগুলো যাচ্ছে ভেসে
আমজনতার স্রোতের তোড়ে

নতুন চিন্তানায়ক এসে
পুরোনোদের আসন টলায়
হাত ধরেছি জোট বেঁধেছি
গান ধরেছি ভাঙা গলায়।

এই ফাগুনে নতুন আগুন
আজকে সবার হৃদয় তাতায়
নতুন গল্প হচ্ছে লেখা
ইতিহাসের পাতায় পাতায়

রক্ষা নেই আর ঘাতক তোমার
কাজ হবে না ছলাকলায়
হাত ধরেছি জোট বেঁধেছি
গান ধরেছি ভাঙা গলায়।

স্বপ্ন বুনি মশাল জ্বেলে
চোখের জল আর রক্ত ঢেলে
লাঙল দিয়ে খুঁড়ছি মাটি
আন্দোলনের নতুন ফলায়।
হাত ধরেছি জোট বেঁধেছি
গান ধরেছি ভাঙা গলায়।

জন-রক্তে জ্বলে আগুন

নাজিমুদ্দীন শ্যামল

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সিইউজে

আগুন জ্বলছে বাংলাদেশে
শাহবাগ থেকে চট্টগ্রামে।
রক্তে রক্তে জ্বলছে আগুন
সব মানুষের। বোধের মাঝে
জ্বলছে আগুন একাত্তুরের
মুক্তিযুদ্ধের। জ্বলছে তরুণ,
জ্বলছে মানুষ জ্বালিয়ে দিতে
নতুন ফাগুন।

বুকে বাজছে দ্রোহের উৎসব
জেগেছে তারুণ্য। তরুণ আগুন
নগর থেকে গ্রাম পুড়ছে।
আগুন এখন সমুদ্র থেকে
আকাশ বাতাস ছুঁয়েছে অরণ্য।

আগুন আগুন জ্বালিয়ে দাও!
ও তারুণ্য আগুন খেলায়
আমায় তোমার সাথে নাও!

অগ্নিমন্ত্র শিখে নিও উড়াল পাখি,
দিগ্বিদিকে আগুন আগুন, জ্বালিয়ে
দিলো শত্রুপক্ষ। পুড়িয়ে দিতে শাদা–
পালক চতুর্দিকে আগুন দিলো।

দশদিকে দেখে নিও নতুন পাখি,
মিত্র স্বজন মশাল নিয়ে আগুন
খেলায় মেতে উঠলো রাত্রি শেষে!
তুমিও তখন আগুন খেলবে
তাদের সাথে অগ্নিযুদ্ধে শামিল হবে,
রাত্রি শেষে ভোর আসবে সূর্য উঠবে।

নতুন করে বুঝে নিও প্রিয় পাখি;
আগুন দিয়ে আগুন রুখবে,
সৃষ্টি দিয়ে সর্বনাশ। তোমার জন্য
দিয়ে গেলাম অগ্নিসূর্য, যুদ্ধমন্ত্র।
তোমার জন্য দিয়ে গেলাম
আগুন খেলার একটি আকাশ।

এ আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য জাতি পাবে

মুহাম্মদ শামসুল হক

জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক, প্রথম আলো

যে ব্যক্তি বা জাতি তার জন্ম, অর্জন ও ত্যাগের ইতিহাস ভুলে যায় সে ব্যক্তি বা জাতির জন্মের কোনো সার্থকতা থাকে না। তার অর্জন স্থায়ী হয় না। বাঙালি জাতির জন্ম তথা স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে যে অপরিসীম ত্যাগ ও লাখো প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা ঘটেছে ৭৫ সালের পর থেকে সে ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে ৭১ এর নির্যাতক, ধর্ষক ও খুনিদের সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনেকটাই অন্ধকারে থেকে যায়। অন্যদিকে তালোভীদের আশ্রয়ে থেকে খুনি-যুদ্ধাপরাধীরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গে অনুপ্রবেশ ও ডালপালা বিস্তার করে। বেসরকারি পর্যায়েও কোচিং সেন্টারসহ নানা রকম ব্যবসা ও ধর্মীয় সংগঠনের মুখোশ পরে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত হয় অনেকে। স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধপরাধীদের বিচারে অঙ্গীকারাবদ্ধ বর্তমান সরকার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করলেও আইনের মারপ্যাঁচ, দেশি-বিদেশি চাপ ও ষড়যন্ত্রের কারণে তা জাতির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করবে কি না এ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। উদ্বেগের বিষয় হলো, এরই মধ্যে যুদ্ধাপরাধী ও তাদের আশ্রয়দাতাদের পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা নব্য-জামায়াত-শিবির কর্মীরা অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে দুর্বল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

এ অবস্থায় দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে নতুন প্রজন্ম যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি তথা ফাঁসির দাবিসহ রাজাকারদের বিরুদ্ধে ঘৃণার মশাল জ্বালিয়ে যে নতুন ধরনের আন্দোলনের সূচনা করেছে তা সরকারসহ ইতিহাস বিস্মৃত প্রায় জাতির জন্য নতুন আলোকবর্তিকা।

এ আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি যেন ৭০-৭১-এর মতো আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা পেল। এ আন্দোলন একই সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক-শ্রোতাদের জন্য ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রও তৈরি করল।

আশা করি, এ আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য জাতি পাবে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার নতুন সোপান তৈরিতে সহায়ক হবে এ আন্দোলন।

সশ্রদ্ধ অভিবাদন সেই তারুণ্যকে

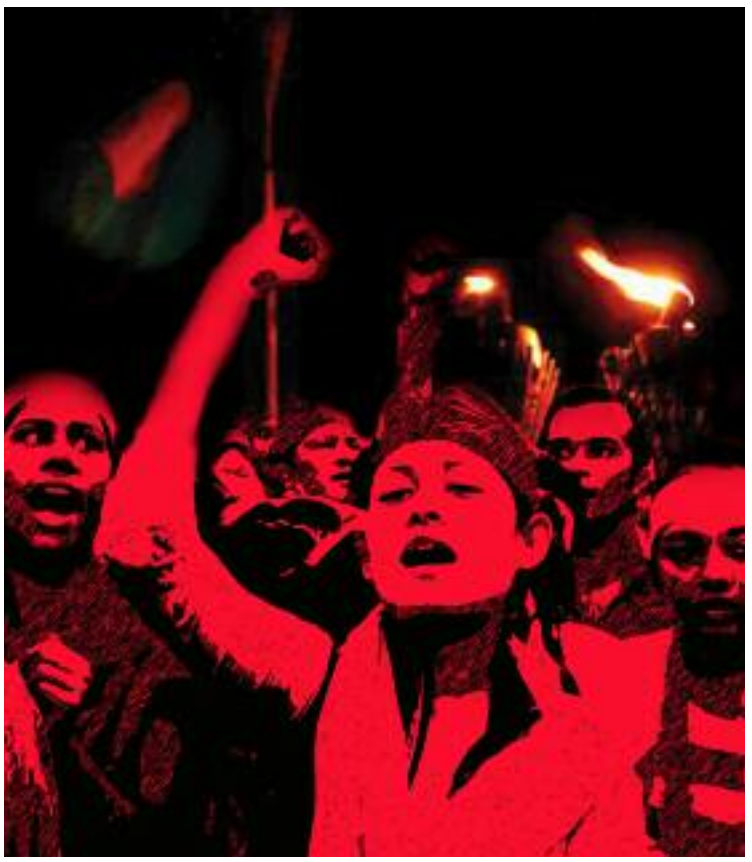

স্কেচ : আজিজুল কদির

শামসুল ইসলাম

চিফ রিপোর্টার, দৈনিক পূর্বদেশ

যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে উত্তাল এখন সারা দেশ। ঢাকার শাহবাগ থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের প্রেস ক্লাব চত্বর, রাজশাহীর বঙ্গবন্ধু চত্বর, সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বরিশালের টাউন হল চত্বর, খুলনার শিববাড়ি মোড়সহ দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলাতেও উন্মেষ ঘটেছে গণজাগরণের। আর এই নতুন জাগরণে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন দেশের তরুণসমাজ। অন্তর থেকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে চাই তাদের সেই তারুণ্যকে।

শাহবাগ প্রজন্ম স্কয়ারের আদলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরকে নামকরণ করা হয়েছে 'গণজাগরণ মঞ্চ'। যুদ্ধাপরাধী আবদুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন রায় ঘোষণার পরদিনই চট্টগ্রামের একঝাঁক তরুণের সংগঠন 'সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী তরুণ উদ্যোগ' প্রেস ক্লাব চত্বরে প্রথম তাঁর ফাঁসির দাবি নিয়ে অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে। প্রথম দিনই বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষার্থী, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের জনতা অবস্থান নিয়ে কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। এরপর থেকে যতই দিন গড়াচ্ছে গণজাগরণমঞ্চকে ঘিরে আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়ছে সবার। সৃষ্টি হচ্ছে অন্য রকম এক আবহ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা প্রতিদিনই নতুন নতুন কর্মসূচিতে মাতিয়ে রাখছে পুরো জামাল খান এলাকা। বিকেল গড়াতেই চেরাগি পাহাড় মোড় থেকে জামাল খান মোড় পর্যন্ত পুরো এলাকা মধ্যরাত পর্যন্ত মুখরিত থাকছে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে নানা গান, স্লোগান, বক্তৃতা আর কবিতায়। রাস্তায় আঁকা হচ্ছে নানা প্রতিবাদী আলপনা। এ কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে সর্বস্তরের মানুষ। কোলের শিশুকে নিয়ে আসছে মায়েরাও। নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররাও শিখছে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে নতুন স্লোগান 'ক-তে কাদের মোল্লা, তুই রাজাকার তুই... '। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার বিচারের রায়কে কেন্দ্র করে দেড় সপ্তাহ আগে প্রেস ক্লাব চত্বরে যে জাগরণের বীজ বপন করা হয়েছিল-তা আজ ছড়িয়ে পড়ছে চট্টগ্রামের স্বাধীনতার পক্ষের সর্বস্তরের জনতার মাঝে। স্বাধীনতার একচল্লিশ বছরে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনতাবিরোধীদের বিপক্ষে জাতিকে এভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলেও তা করে দেখিয়েছে তরুণ সমাজ।

রাজপথ ছেড়ে যাওয়া যাবে না

হাসান ফেরদৌস

ব্যুরো চিফ, বৈশাখী টেলিভিশন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল, যখন স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের আস্ফালনে পুরো জাতি শঙ্কিত হয়ে পড়ে ঠিক সেই মুহূর্তে আবারো ঘুরে দাঁড়াল বাঙালি জাতি। ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে যেভাবে পুরো জাতি যেভাবে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক সেই ভাবে আবার ৪২ বছর পর 'জয় বাংলা' স্লোগানে রাস্তায় নামল শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী নারী-পুরুষ। দাবি-'যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চাই', 'জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ কর', 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ কর।'

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর সেনাশাসক জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। ধ্বংস করা হয় মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা ঘোষণা দিয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় বর্তমান মহজোট সরকার। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। কিন্তু এই বিচার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করতে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের সাথে হাত মেলায় স্বাধীনতাবিরোধী চক্রসহ সহযোগীরা। গত বছরের শেষদিকে জামায়াত-শিবিরসহ তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে দেশ অস্থিতিশীল করে তোলে। ঘোষণা দেয় গৃহযুদ্ধের। জামায়াত-শিবিরের তাণ্ডব-নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গত বছরের শেষদিকে কিছু সাংবাদিক-যুবক-তরুণদের গড়া সংগঠন 'সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী তরুণ উদ্যাগ'র পরিকল্পনায় শুরু হয় সম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন।

এর মধ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয় শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার বিচারের রায়। ৬টি অভিযোগের মধ্যে '৫টি সন্দেহাতীত'ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু এ রায় মেনে নিতে পারেনি ছাত্র-যুব-তরুণেরা। প্রতিবাদে নেমে পড়েন রাস্তায়। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামে শুরু হয় যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন। সম্প্রদায়িকতাবিরোধী তরুণ উদ্যোগে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের পর ৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে শুরু হয় প্রতিবাদী অবস্থান কর্মসূচি। যোগ দেয় ছাত্র-যুব-তরুণ-তরুণী, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আন্দোলনের এখন মূল কেন্দ্রবিন্দু চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বর। সর্বস্তরের সাংবাদিক, প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তা-কর্মচারীও হয়ে উঠেছেন নতুন প্রজন্মের তরুণদের এই গণজাগরণের অংশীদার হিসেবে।

লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে না তোলা পর্যন্ত রাজপথ ছেড়ে যাওয়া যাবে না। দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেও। আপসকামিতা পরাজয় ডেকে আনতে পারে। আবার যদি সেই পরাজিত মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট চক্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে তা হলে বাংলাদেশ হবে তালেবান। মনে রাখতে হবে, বিষধর সাপকে দুধকলা দিয়ে পুষলেও স্বভাবজাত চরিত্র হিসেবে ছোবল দেবেই। ঘাতকচক্রের ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে যায়নি।

আমার বাংলাদেশ কেমন আছো

রাশেদ রউফ

সিনিয়র সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

আমার স্বদেশ তুমি কেমন আছো?
আমার মাতৃভূমি কেমন আছো?

আকাশের নীল মুখ কালো হয়ে যায়
ভালোগুলো ঢেকে যায় বিষাদ ছায়ায়–
দেশের মাটিতে জাগে শঙ্কা-প্রলয়
টুকরো টুকরো হয় অযুত সময়।

নিসর্গ গাছপালা কাঁপে থরথর
মাথার ওপর নামে আচমকা ঝড়
ছেঁড়া পালকের মত জীবন ওড়ে–
পেণ্ডুলামের মত দোলে ও ঘোরে।

আমার স্বদেশ তুমি কেমন আছো?

হিংস্র নখর আছে, থাবা আছে আর
ব্যথার আগুনে পুড়ে হও অঙ্গার।
রক্তের ডেলা নিয়ে কারা করে খেলা
ছড়ানো ধুলোর মত কাটায় কে বেলা।
সব কিছু জানো তুমি– দেখো দশদিক–
গভীর সাগরে তুমি একাই নাবিক।

হে আমার প্রিয় ভূমি, দাঁড়াও উঠে
নদীর স্রোতের মত যাও হে ছুটে
কবে তুমি হবে বলো পাল তোলা নাও
গাও তুমি জয়গান– অস্ত্র শানাও।

দাবার ঘুঁটির মত চাল চালে যারা
গতিহারা হবে তারা, হবে প্রাণহারা
চিতার ছাইয়ের মত হবে নিঃশেষ
দাঁড়াও আমার প্রিয় হে বাংলাদেশ।

বাধার পাহাড় ভাঙো শত-অবিরত
আমার স্বদেশ তুমি থাকো অক্ষত।

ধর্ম-সন্ত্রাস

এজাজ ইউসুফী

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

রক্তমাখা পাতার সন্ত্রাসে বেড়ে ওঠে
ধর্মদ্রোহী এক।
ত্রিশিত ত্রিকোণ নাভি চিরে
প্রত্নজমি তাকে হাতছানি দেয়
কাটামুণ্ডু চায় প্রেম,
চায় রক্ত তাই
মোল্লার উত্থিত লিঙ্গ যেন
শিবের শাবক।

সুদর্শন-চক্র ছোড়ে মৃত্তিকা আঙুল
গিলমানদের শিকারি গুহায়,
কবির শিজদা আজ মানে না সুদ্রক
বিফলে ভোলায় তাকে কুন্তির সাধনা

জাগ্‌রে জাগ্‌

আল রাহমান

স্টাফ রিপোর্টার, সুপ্রভাত বাংলাদেশ

লাল সবুজের এই পতাকায়
হাসছে দেখো শাহবাগ
আধমরাদের বলছি শোনো
সময় হলো জাগ্‌রে জাগ্‌।

লাখো তরুণ জ্বালছে আগুন
বলছে তারা 'ফাঁসি চাই,
অনেক বছর পার পেয়েছিস
এবার তোদের রক্ষা নাই।

আগুন-আলোর ছোঁয়া পেয়ে

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

যুগ্ম সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো

বুকের ভেতর বারুদ ছিল জমা
আগুন-আলোর ছোঁয়া পেয়ে
জাগরণের সে গান গেয়ে
বীরাঙ্গনার রূপ নিয়েছে স্বদেশ-প্রিয়তমা।

জনস্রোতে জাগলো নদীর জোয়ার-ই
ঘুমিয়ে ছিল আধমরারা
তরুণ দিলো প্রাণের সাড়া
তারুণ্য আজ ক্ষিপ্র ঘোড়ার সওয়ারি।

দেশ ভেসেছে তারুণ্যের এ উচ্ছ্বাসে
রাজাকারের ফাঁসি হবে
মুক্তিসেনার হাসি হবে
সবুজ জমিন লাল সূর্যের দিন আসে।

বন্ধ হবে ইতিহাসের বিকৃতি
বাপকে দেবো সান্ত্বনা, আর
কমবে বোনের যন্ত্রণাভার
মা পাবে তার চোখের জলের স্বীকৃতি।

মায়ের কোল পবিত্র থাকুক

কামাল পারভেজ

ব্যুরো চিফ, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর

শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন, রিকশাশ্রমিক আউয়াল। সাথে আরো চারজন। কদিনের রোজগারের টাকা জমিয়ে এসেছেন, বরগুনা থেকে। দিনভর কিছু খাননি। গ্রামে বউ-সন্তানরা কিছু খেয়েছেন কি না জানেন না। তাতে কী! শাহবাগের আকাশ কাঁপানো, দেশের হৃদয় কাঁপানো-লাকিদের মুখে দেশকে লজ্জামুক্ত করার স্লোগান শুনে কাঁদছেন আউয়াল। চোখে জল অন্যদেরও। অদ্ভুত। অভূতপূর্ব। কীসের টানে এসেছেন, এরা। কেন অভুক্ত থেকে কাঁদছেন, এই খেটে খাওয়া মানুষগুলো?

বারডেমে চিকিৎসা নিতে আসা মরণাপন্ন একজন-শয্যা ছেড়ে স্যালাইনের নল নিয়েই নেমে এসেছেন রাস্তায়। কণ্ঠে জোর নেই। তবু, সহস্রকণ্ঠের স্রোতে মিলিয়ে দিচ্ছেন নিজের অব্যক্ত শ্বাসটুকু। শত কষ্টের পরও উঁচিয়ে দিচ্ছেন শীর্ণ হাতটা। শবশয্যা হোক, এই পিচঢালা পথ-ইশারায় বোঝাচ্ছেন সঙ্গের মানুষটিকে। অভাবনীয়। কীসের এই আকর্ষণ!

আমার এক বন্ধু। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকুরে। রাজনীতি বিষয়টা যার কাছে সব সময় নাক ছিটকানোর। এখন রোজ সন্ধ্যা হলেই, ছুটে যাচ্ছেন প্রেস ক্লাব চত্বরে। হাত উঁচিয়ে স্লোগান তুলছে না ঠিক, কিন্তু জামালখান যখন কেঁপে উঠছে সোচ্চার-বজ্রকণ্ঠে-তখন তার ঠোঁটও কাঁপছে অজান্তে। স্লোগানের সুরে। উদীপ্ত তরুণ। সেও জানে না, কীসের টানে আসা। এমন অনেকে রোজ জড়ো হচ্ছেন, শাহবাগ থেকে বন্দরনগরীর প্রেস ক্লাব চত্বর। সেই সাথে সারা দেশের গণজাগরণমঞ্চে। যাদের কাছে রাজনীতির কোনো মানে জানা নেই। আন্দোলনের অর্থ অজানা। সামনে কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে-সেটা জানার কোনো গরজ নেই। তারা একটাই কেবল দেখেছে, দেশের মান বাঁচাতে একদল বাঁশিওয়ালা ডাক দিয়েছে। রক্তে কাঁপন জাগানো সেই ডাক।

কোনো এক দেশপ্রেমিক বলেছিলেন, সব মানুষ নাগরিক হতে পারে। কিন্তু দেশের সন্তান সবাই হতে পারে না। সবার কাছে দেশ মা হতে পাওে না। যারা সন্তান তাদের কাছে মায়ের সম্মান, সব কিছুর ওপরে। যারা বাংলাদেশের সন্তান, তারা কেউই আজ ঘরে নেই। বাঁশিওয়ালার সুরে, অমোঘ টানে-রাজপথে নেমেছে। মায়ের মান বাঁচাতে হবে। কারণ, মায়ের পবিত্র কোলে, আজন্ম পাপীর জায়গা হতে পারে না।

দেখ চাহিয়া

জাহেদ মোতালেব
সহ-সম্পাদক, দৈনিক আজাদী

মাকে প্রতিদিন যেভাবে দেখি, স্ত্রী অথবা সন্তানকে, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীকে; সেভাবেই দেখতে চাই দেশকে। বিকেলে প্রতিদিন সূর্যের রং দেখে, আকাশের কারুকাজ দেখে হাঁটি। শ্যামল রূপ দেখে মোহিত হই। আমি সেভাবে বাংলাদেশকে দেখতে চাই। প্রতিদিন সকালে সূর্যের রঙে রঙিন ধানপাতা-সবুজ বাংলাদেশকে দেখতে চাই।
বন্ধুদের সাথে যেমন আড্ডা দিই, সময় কাটাই, তেমন এক রঙে দেশকে রাঙাই। সেই অনুভবে থাকতে চাই। সম্প্রীতির যে সুর বাংলার আনাচে-কানাচে বাজে, সেই সুর আরো বাজুক, ভরে উঠুক প্রাণ। মায়ের মতো এমন প্রার্থনায় দিন কাটাই।
যদি সেই রঙে কেউ কালি মেরে দেয়, তার কী হবে? সুন্দর এবং সাম্প্রদায়িকতা একসাথে যায় না। তাই জেগে ওঠে বাংলার প্রাণ। বাংলার প্রাণে তখন সুর বাজে। তরুণ প্রাণ বলে, মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে ভয় করি না মরণে। মরণে যে ভয় নাই তা আমরা জানি।
দাদি বলে, কত কিছু দেখলাম! সেই দেখাটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।
দাদি বলত, বাঙালির কাছে কেউ যখন বাধা হয়ে আসে, তা বেশিদিন সে সহ্য করে না। উর্বর মাটির মতো তার মনও উর্বর। উর্বর মনের সব হিসাব পাওয়া ভার। সে যেকোনো কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে।
তখন ইতিহাসের স্যার এসে মনের এক কোনায় বসেন। বলেন, কিরে মনা, বলেছিলাম না? আমি বলি, স্যার কী বলেছেন? স্যারের চোখে-মুখে হাসি। তিনি বলেন, ধর, তোর আশপাশে প্রচুর পানি। চাওয়া মাত্রই পানি পাস। পানি দেখে নরম সুর তৈরি হয় মনে। তোর একটা দীর্ঘ বর্ষাকাল আছে, অনেক নদী আছে। তার স্রোতে প্রবাহিত মন। তুই স্রোতের মতো। তোর কতগুলো পাহাড় আছে! সেইসব পাহাড়ের মতো দৃঢ়তা তৈরি হয়েছে তোর মধ্যে। আছে এক সাগর। বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মতো প্রাণে বাজে বীণা। এখন তুই কী করবি?
আমি স্যারের চেহারায় নদী, সাগর আর পাহাড় দেখি।
স্যার বলেন, চুপ কেন? বলে আমার দিকে গভীরভাবে তাকান।
আমি তখন ঢেউয়ের মতো দুলি।
স্যার বলেন, যার মধ্যে অনেক নদী আছে তাকে কেউ কখনো পরাজিত করতে পারে না। কেন পারে না জানিস? কারণ সে স্রোতের মতো হয়ে যায়। স্রোতকে কেউ কখনো বাঁধ দিয়ে রাখতে পারে?
আমি বুঝে যাই সব।
স্যার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলেন, জনতার জয় হোক। তাহলে সব সুন্দর হয়ে যাবে।
মনের মধ্যে সুর তোলে এক নদী। নদীটার নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ-নদীর সুরে দ্রোহী হই আমি।

গণজাগরণের উত্তাল ঢেউ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগুন এই প্রজন্মের হৃদয়ে আজ লেগেছে যার সমাপ্তি কেবল ৭১'এর ঘাতকদের সর্বোচ্চ শাস্তির মধ্যে দিয়েই শেষ হবে। হাজার হাজার মানুষ সারা দেশ থেকে এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এ আন্দোলনে ৬ মাসের শিশু থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ সবাইকে দেখা গেছে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, রাজাকারদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে, আলো প্রজ্বালন করছে।
স্বাধীনতার পক্ষে আজ পুরো দেশ, এদের শক্তি এতটাই বিশাল যে তাদের সামনে স্বাধীনতা বিরোধীরা দাঁড়াতেই ভয় পাচ্ছে–বলার সাহস পাচ্ছে না। এ বিপক্ষের শক্তি যারা, তারা সংখ্যায় খুব সীমিত বলেই কয়েকজন মিলে নানা রকম তাণ্ডব চালায়। সংখ্যায় তারা কতজন? বিশ হাজার? পঞ্চাশ হাজার? এক লক্ষ? দেড় লক্ষ? দুই লক্ষ? ষোল কোটি মানুষের এ দেশে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কখনই দাঁড়াতে পারবে না, যদি সবাই একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়ায়। আর ঠিক এমনটাই ঘটছে এখন শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে। ঘটছে বাংলার প্রতিটি জেলায় জেলায়। এ জোয়ার তারা
রুখবে কেমন করে? বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, এ দেশের তরুণরা যখন দল-মতের উর্ধ্বে উঠে কোনো জাতীয় ইস্যুতে একতাবদ্ধ হয়ে রাজপথে নামে, তখন বিজয়ী হয়েই ঘরে ফেরে। ভাষা আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে আর তরুণরাই ছিল এই আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ দেশের ছাত্রসমাজ ৬৯-এর ধারাবাহিকতায় এক দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগের ইতিহাস, বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ, অপরিমেয় রক্তপাতের ইতিহাস ১৯৭১। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজয় করে সোনালি বিজয় ছিনিয়ে আনে। এ যুদ্ধেরও মূল চালিকাশক্তি ছিলেন তরুণরাই। ১৯৮০ সালে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনও শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। আবার সেই তরুণদেরই দেখা যায় অগ্রণী ভূমিকায়। সর্বশেষ ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলে এ দেশের তরুণসমাজ তাতে সাড়া দেয়। বিপুল ভোটে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে নির্বাচিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। এরই মধ্যে দুটি রায় হয়েছে। কাদের মোল্লাকে নিয়ে অগ্রহণযোগ্য রায়ের বিরুদ্ধে এবং কসাই কাদেরের ফাঁসির দাবিতে তরুণ প্রজন্ম নেমে এসেছে রাজপথে, হে তরুণ-তোমাদেরই তো এটা মানায়। শাহবাগ এলাকা অবরুদ্ধ করে রেখেছে তারা, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রামের প্রেস ক্লাব চত্বরের গণজাগরণমঞ্চ ছেড়ে যাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে চট্টগ্রামের তরুণসমাজ। তাদের প্রতিটি কর্মসূচিকে নিরন্তর সহযোগিতা জোগাচ্ছে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবসহ চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সংবাদিকসমাজ।

তারুণ্যের জয়গানে জাতি একাকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জনতায় প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছিল। বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে। এদেশীয় দোসরদের আকণ্ঠ সহযোগিতা সত্ত্বেও পাক হানাদাররা পরাজিত হয়েছিল। আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম আমাদের স্বাধীনতা।
কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী চক্রটি সবসময় সক্রিয় ছিল অপশক্তি হিসেবে। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বাদও ভোগ করেছে বীরদর্পে। মসনদে বসে তারা সবসময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্রান্তে জড়িত ছিল। হুংকার ছুড়েছে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়ে। এবার জেগেছে তারুণ্য।
মানবতাবিরোধী অপরাধী, রাজাকারদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবিতে রাজপথে নেমেছে তরুণরা। সেদিন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এবার আছেন তাঁরই তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতা। শেখ হাসিনার ডাকে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি। যুদ্ধাপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর রূপকার তিনিই। শাহবাগ থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরের জাগরণমঞ্চে তারুণ্য নিংড়ানো উচ্ছ্বাস, ঘাতকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।
আমি আজ বিমোহিত। এভাবে আরও আগে জেগে উঠতে পারলে ৪২ বছর পর এ স্বাদ অপূর্ণ থাকত না। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার চক্র দাপিয়ে চলতে পারত না। কিন্তু আজ হতাশার কিছু নেই। নতুনরা আমাদের মাঝে নতুন প্রাণ ছড়িয়েছে। বিষণ্ন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন সায়াহ্নে আবার উদ্দীপনা। বেদনার এই ক'বছর স্মৃতি থেকে ঝরে পড়েছে। বুক থেকে সরে যাচ্ছে পাথর। রাজাকারদের ফাঁসির দাবির প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি গগণবিদারী স্লোগান অনেকের বুক হালকা করছে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। এ বয়সে আমার মাঝেও এসেছে নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্দীপনা। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে ঐতিহ্যের ঝাণ্ডা নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শুধু বিশ্বাস নয়, এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে আমাদের ভূমিকা বরাবরই স্পষ্ট। কোনো ভণিতা নয় আমরা জাতির মুক্তির সনদ আর '৭১ এর চেতনায় সব সময় উদ্বুদ্ধ। তারুণ্যের জয়গানে আমরা একাকার। রাজাকারদের ফাঁসি দিয়ে দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে, জাতিকে করতে হবে কলঙ্কমুক্ত। কালো তিলকটি তখনই মুছবে যখন মানবতাবিরোধী অপরাধীদের ফাঁসি নিশ্চিত হবে। দেশের তরুণসমাজ জাতিকে যেভাবে জাগিয়ে তুলেছে, আমার বিশ্বাস বিজয় আসবেই।
বাংলার মাটিতে কোনো রাজাকার-আল বদরের ঠাঁই হবে না।

স্যালুট তারুণ্যের জাগরণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেখ মুজিবুর রহমান জয় বাংলা স্লোগানে দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে '৭১-এ জাগিয়ে তুলেছিলেন। যার প্রাপ্তি ছিল এ স্বাধীনতা। ঢাকার শাহবাগের প্রজন্মের বাধাহীন ইন্টারনেটের সামাজিক ব্লগ যোগসূত্রে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরেও প্রতিবাদীদের অবস্থান। মানবতাবিরোধী অপরাধী রাজাকারদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে একযোগে সোচ্চার তারা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মুষ্টিবদ্ধ থাকার দীপ্ত শপথ। কোনো রক্তচক্ষু আর আড়াল থেকে রাজাকারদের অট্টহাসি ভয় করে না প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ টগবগে তারুণ্য। দীপ্ত শপথে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব নৈতিকভাবে শুধু সমর্থন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি, প্রজন্মের জাগরণে একাকার। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবই এখন জাগরণের সূতিকাগার। সব ধরনের দ্বার উন্মুক্ত নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে আমরাও নির্ভীক সাহসী কলম সৈনিক।
আমাদের প্রত্যাশা ব্লগার তরুণরা স্বাধীনভাবে জাতিকে '৭১ এর চেতনা নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি তাদের ধমনিতেও এখন সেই চেতনার উদ্দীপনা। আগামী যুগ যুগ ধরে বহমানে–এমন একটি ক্ষণ ছিল যেন বড়ই জরুরি। মানবতাবিরোধী অপরাধীরা স্বাধীনতার ৪২ বছরের অধিকাংশ সময় দাপিয়েছে। ক্ষমতার মসনদে বসে ছাই করতে চেয়েছে সাহসী বাঙালির সব অর্জন। মুক্তিযোদ্ধা তথা জাতির কাছে বড়ই ন্যক্কার, বড়ই কলঙ্কময়।
আজ এ কলঙ্ক থেকে মুক্তির সময় এসেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ হয়েছে বিচারের মুখোমুখি করে। ধন্যবাদ মহাজোট সরকার। ধন্যবাদ গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তারপরও কৃতকর্মের শাস্তি সর্বোচ্চ মেলেনি। তাই সংক্ষুব্ধ পুরো জাতি। মুহূর্তে নতুন প্রজন্ম জেগে উঠেছে। সর্বস্তরের গণমানুষ হাত মিলিয়ে একাকার এ তারুণ্যে। বিবেদ ভুলে একাকার। এ সম্মিলন হতে পারে জাতির মুক্তির সনদ। ভিশন-২০২১। যেখানে থাকবে না কোনো সাম্প্রদায়িকতা আর দারিদ্র্য-স্বাধীনতার চেতনার দর্শন। বাধাহীন ডিজিটাল গণমাধ্যমে এ তরুণ সমাজকে দাবাইয়া রাখতে পারেনি কোনো অপশক্তি। নিপাত যাক সব অপশক্তি। ক্ষোভের অনলে পুড়ে ছারখার হোক স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির ও তাদের দোসররা। বীর চট্টলার সংগ্রামী জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। জেগেছে নতুন স্বপ্নে। এগিয়ে যাচ্ছে প্রত্যয়ে...।
স্বাধীনতা সংগ্রাম আর স্বৈরাচার পতনে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর ধরে। এবারও পিছিয়ে নেই জাগ্রত সাংবাদিকরা। অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে আমরা নির্ভীক প্রগতিশীল চেতনায়। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটি জেগে ওঠা তরুণদের বিজয় দেখতে চায়। অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তার দুয়ার খোলা বিজয়ের ক্ষণটির জন্য। বিজয় হোক গণজাগরণ রূপকারদের। বিজয় হোক এদেশের মানুষের। পূরণ হোক সব প্রত্যাশা। দেশপ্রেম বোধে জাগরিত তরুণ সমাজের আধুনিক বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

জয় আসবেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

আসার খবর পেলে আগে-ভাগে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নিতেন পুকুরে। কচুরিপানার ফাঁকে মুখ লুকিয়ে নিশ্বাস নিতেন। আবার কেউ লুকাতেন বিশেষভাবে তৈরি মাটির গর্তে। ধানক্ষেতে লুকাতেন বাড়ির পুরুষরা। বাড়ির বৌ-ঝিদের চুলার ছাই চালতে দিতেন, যাতে তাদের বিশ্রী দেখা যেত। ছুটির দিনে বাড়ি ফিরে বাবা সময় পেলেই আমাদের শোনাতেন যুদ্ধদিনের সেই ভয়াল সময়ের নানা কথা। বাবার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। আমাদের বলতেন, তাদের মতো দেশপ্রেমিক এদেশে আর হবে না। বঙ্গবন্ধুর মতো সাহসী নেতৃত্ব না থাকলে এদেশ কখনই স্বাধীন হতো না। তিনি ঘৃণা করতেন গোলাম আজম, নিজামী গংদের। শোনাতেন একাত্তরে তাদের ঘৃণ্য অপকর্মের কথাও।
স্বাধীনতাবিরোধীদের অশুভ চক্রান্ত থেমে থাকেনি স্বাধীন দেশেও। স্বাধীন দেশের পতাকা উড়িয়েছে পাক বাহিনীর সেই দোসররা। তারা চেয়েছিল এদেশকে মৌলবাদের ঘাঁটিতে পরিণত করতে।
২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে ক্ষমতায় গেলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার ঘোষণা দেয়। সেই কারণে এদেশের তরুণসমাজ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। ক্ষমতায় আসার পর তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করায় দেশের আপামর তরুণসমাজ তাদের সাধুবাদ জানায়। মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশের পর উজ্জীবিত হয়েছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু আরেক কুলাঙ্গার কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন সাজার রায়ে বিস্মিত আপামর জনতা। এ রায় মেনে নিতে পারেনি তরুণসমাজ। ক্ষোভে ফেটে জ্বলে ওঠে তরুণরা। শাহবাগের প্রজন্ম স্কয়ার এবং চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরের গণজাগরণমঞ্চ থেকে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়েছে সারা দেশে। সারা দেশে এখন একটিই স্লোগান–ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি চাই। তরুণদের এই স্লোগানে প্রকম্পিত বাংলাদেশ। আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ না দেখলেও দেখছি সেই যুদ্ধের ঘাতকদের বিচার দাবিতে গড়ে ওঠা আরেকটি যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমাদের জয় আসবেই।

'তবু মাথা নোয়াবার নয়'

পৃষ্ঠা ২-এর পর

অবিশ্বাস করেন। একে অন্যকে ধ্বংসের খেলায় মাতেন। ৭১-এ সন্তান হারানো বাংলা মা চোখের জলে প্রতীক্ষায় থাকেন। শহীদের সন্তান বেড়ে ওঠে। নবীন প্রজন্মের হৃদয়ের কোঠরে জেগে ওঠে বাংলার প্রাণস্পন্দন। সংখ্যায় কম হলেও দাবিতে জোরালো। মিছিল শহীদ মিনারমুখী।
চিহ্নিত রাজাকার কাদের মোল্লার ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন মানতে পারে না, তরুণদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা দেশ। রায়ের পরপরই চট্টগ্রামের জামালখান প্রেস ক্লাব চত্বরে বিক্ষোভের ডাক দেয় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী তরুণ উদ্যোগ নামে একটি সংগঠন, সাথে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও ব্লগার। সাথে থেকে আন্দোলন শক্তি জোগায় চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংবাদিকরাও। ঢাকার শাহবাগের সাথে সংহতি রেখে চট্টগ্রামের প্রেস ক্লাবের সামনের চত্বরের আন্দোলন রূপ নেয় গণআন্দোলনে। কোনো রাজনৈতিক দল বা সামাজিক গোষ্ঠীর বৃত্ত ভেঙে এ আন্দোলন সব স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে তারুণ্যের বিপ্লবে পরিণত হয়। সবার এক দাবি 'ফাঁসি চাই'। দেশের সব আন্দোলনের সূতিকাগার এই বীর চট্টলা। চট্টগ্রামের এই আন্দোলনে সবসময়ের মতো একাত্ম সাংবাদিকরাও। দেশের প্রয়োজনে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা পাশে থেকে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত চলমান এ আন্দোলনকে সাহস জোগাচ্ছেন।
শাহবাগের তারুণ্যের প্রাণের ডাকে আওয়াজ চলছে চট্টগ্রামের জামালখানের প্রেস ক্লাব চত্বর থেকে সারা দেশে। অনেকেই অনেক কিছুই বলেন, এর কী হবে, এটা অনেক কিছুই হবে...। আমি বলি, আমাদের প্রাপ্তি অনেক, অনেক কিছুই। তারুণ্যের দুকূলপ্লাবী জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব আড়ষ্টতা।
সুকান্তের কবিতার মতোই বলতে হয় '...এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়।'

একটি ফাঁসির অপেক্ষায় চট্টগ্রাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

জঘন্যতম কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ সময় তার দুই পুত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী তাদের সমস্ত পাশবিকতা ও বর্বরতা নিয়ে পিতার সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীর চট্টগ্রাম শহরস্থ বাসভবন 'গুডস হিল' হয় জ্যান্ত বিভীষিকার পাহাড়ি-বাঙালি নিধনের এক কসাই খানায়।

১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষদিকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের বিগ্রেডিয়ার শিঘ্র এবং লে. ক. ফাতেমী ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং ফজলুল কাদের চৌধুরীর পরামর্শ মোতাবেক নিরস্ত্র বাঙালিদের পাইকারিভাবে হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীর অধীনে বালুচ রেজিমেন্ট হতে প্লাটুন সেনা মোতায়েন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল হতে ফজলুল কাদের চৌধুরীর পরামর্শে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পাইকারি হারে বাঙালি নিধন অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক অভিযান শুরু করা হয় ফজলুল কাদের চৌধুরীর নির্বাচনী এলাকা হাটাজারী-রাউজানে। এ সমস্ত এলাকায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে হাটহাজারী মুসলিম লীগ (কনভেশন) নেতা আলী আহমদ টি কে (মৃত) এবং ফজলুল কাদের চৌধুরীর তনয় খোকন ওরফে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী (১৯৭১ সালে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী 'খোকন' নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন)। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের নিকটবর্তী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এআর মল্লিক, শিক্ষক ড. জাকির উদ্দিন, ড. আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান, ড. শামসুল হক, ড. আলী ইমদাদ খানসহ প্রায় ৪৭ জন অধ্যাপক পরিবার পরিজনসহ কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর অধ্যক্ষ নতুন চন্দ্র সিংহের রাউজানস্থ বাসভবন 'কুন্ডেশ্বরী ভবনে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী হাটহাজারী রাউজানের দিকে অভিযান শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তাদের পরিবারবর্গ ভারতীয় সীমান্তের উদ্দেশ্যে কুন্ডেশ্বরী ভবন ত্যাগের প্রাক্কালে তারা নতুন চন্দ্র সিহংকেও তাদের সাথে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তার দুই, পুত্রবধু এবং পরিবারের অন্যান্যদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেও তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন– 'আমি এ দেশের মাটিকে ভালবাসি। মৃত্যু যদি আসে তবে দেশের মাটিই হবে আমার চিরনিদ্রার স্থান। আমি এ দেশে, এ মাটি ত্যাগ করে কোথায় যাবো না।'৭১ এর ১৩ এপ্রিল সকালে চারটি আর্মার্ড ট্রাক ও দুটি জীপে করে একদল পাকিস্তানী সৈন্যকে পথ প্রদর্শন করে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী কুন্ডেশ্বরী ভবনে নিয়ে আসেন। প্রত্যদর্শীর বিবরণীতে জানা যায়, নতুন চন্দ্র সিংহ পাকিস্তানী সেনাদলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের বাসভবনের সামনে নিয়ে আসেন এবং কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয় ও ঔষধালয় সংলগ্ন স্কুল ও কলেজের কাজকর্ম ব্যাখ্যা করেন। নতুন চন্দ্র সিংহের কথাবার্তায় পাকিস্তানী সেনা দলের কালুচ ক্যাপ্টেন সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গীয় সেনাদলকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজের জীপের দিকে ফিরে গেলে নতুন চন্দ্র সিংহ তার বাসভবনের সামনে কুন্ডেশ্বরী মন্দিরে প্রবেশ করে প্রার্থনায় রত হন। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় অপর একটি আর্মি জীপে উপবিষ্ট সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আপত্তি জানিয়ে বলেন, তার পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে নতুন চন্দ্র সিংহ ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করতে হবে। বালুচ ক্যাপ্টেন এ নির্দেশ কার্যকর করতে ইতস্তত করলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নিজেই মন্দিরে প্রবেশ করে প্রার্থনারত নতুন চন্দ্র সিংহকে টেনে-হেঁচড়ে মন্দির হতে বের করে আনেন এবং তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের সামন ফেলে দেয়। বৃদ্ধ নতুন চন্দ্র সিংহ মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যান। তিনি মাটি হতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নিজের পিস্তল হতে তাকে লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটি গুলি বর্ষণ করে। এর মধ্যে একটি গুলি তার বাম চোখের নিচে, একটি বুকে, একটি ডান পাজরের নিচে, একটি হাতের বাহুতে বিদ্ধ হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ঘটনাক্রমে সালাউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রামের কুখ্যাত 'মাফিয়া ডনে' পরিণত হন। ফলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কারণে নিহত নতুন চন্দ্র সিংহের পরিবার-পরিবজন মামলাটি চালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। একই দিন অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল '৭১ রাউজান থানার গহিরায় নিজেদের বাড়ির সম্মুখে অবস্থিত হিন্দুপাড়ায় সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অভিযান চালায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ওই বাড়ির চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের কলেজ পড়ুয়া ছেলে দয়াল হরি বিশ্বাসকে ধরে নিয়ে আসে। তার উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয় এবং পরবর্তীকালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস পরিবার-পরিবজনসহ দেশত্যাগ করেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পরও তিনি দেশে ফিরে আসেননি পুত্রশোক ভুলতে পারবেন না বলে। বিশ্বাস বাড়িতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর হামলা চালানাকালীন সময়ে মহেশ মহাজন প্রকাশ মহেশ সাধু ও তার একজন কর্মচারী (বাঁশখালী নিবাসী) নিহত হন।

১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর প্লাটুন ২০ বালুচ রেজিমেন্ট এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে রাউজানে যে হামলা চালায় তাতে প্রায় ২'শ নারী-পুরুষ নিহত হয়। এদের মধ্যে ৩৪ জনের পরিচয় সংগ্রহ করা গেছে। বাকিরা এ ৩৪টি পরিবারের আত্মীয়স্বজন। যারা স্বাধীনতা যুদ্দেব্দর প্রথম প্রহরে তাদের নিকটজনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। একাত্তরের জুলাই মাসে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে তার গুন্ডা বাহিনী আন্দরকিল্লা হতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকালীন মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা জহির উদ্দিন আহমদের দ্বিতীয় পুত্র (বর্তমানে রয়টারে কর্মরত) নিজাম উদ্দিন আহমদকে ধরে 'গুডস হিল' নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে আটদিন ধরে তার উপর নির্মম দৈহিক নির্যাতন চালায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নিজেই। নির্যাতনের ফলে ওষ্ঠাগত প্রাণ বন্দিরা সামান্য পানি পান করতে চাইলে সালাউদ্দিন কাদের প্রস্রাব করে তা বন্দিদের পান করতে বাধ্য করত। প্রাণের মায়ায় বন্দিরা তাই পান করত। দিনের পর দিন বন্দিদের স্যাঁতস্যাতে ঘরের মেঝেতে জমে থাকা থ্যাকথ্যাকে মনুষ্য রক্তের মাঝেই হাত বেঁধে তাদের ফেলে রাখা হত। '৭১ এর নির্যাতনের চিহ্ন এখনো ধারণ করে আছেন সাংবাদিক নিজামউদ্দিন। একাত্তরের জুলাই মাসের শেষদিকে একদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কাগজ ব্যবসায়ী রাউজানের বিনাজুরী ইউনিয়নের লেলেঙ্গরা গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের আলহাজ ফজলুল হক সওদাগরকে তাদের জেল রোডস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে তুলে নিয়ে গুডস হিলের সেই নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যায়। টানা ১৪ দিন ধরে তার উপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। তার অপরাধ ছিল, '৭০ এর নির্বাচনে বাঙালি স্বাধীকার আদায়ের পথ সুগম করার জন্য তিনি মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। গুডস হিল নির্যাতন কক্ষে একটি প্রমাণ সাইজ টেবিলের বিপরীত দিক হতে তিন ইঞ্চি পেরেক টুকে টেবিলকে অনেকটা ব্রাশের মতো করা হয়েছিল। এ পেরেকের ব্রাশের উপর বন্দিকে শুইয়ে উপর থেকে কাঠের তক্তা দিয়ে চেপে ধরা হত। ফলে বন্দির সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে পড়ত। আলহাজ ফজলুল হক সওদাগরকে অনুরূপ নির্যাতন করা হয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর তিনি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে আসামি করে রাউজান থানায় মামলা দায়ের করেছিলেন। ১৯৮০ সালে আলহাজ ফজলুল হক সওদাগর পরলোক গমন করেন। তার রুজুকৃত মামলার ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। একাত্তরের ১৫ এপ্রিল সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এক প্লাটুন পাকিস্তানী সৈন্যসহ আবারো রাউজানে হানা দেয়। সকাল ১০টার দিকে তিনি পাকিস্তানী সেনাদলসহ চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক দিয়ে রাউজান রাঙ্গুনিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং মদুনাঘাট এলাকা হয়ে মাইজ্যা মিয়া নামের তার পিতার একজন চালককে গাড়িতে তার সাথে নেন (এ মাইজ্যা মিয়া পরে মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন।)। পথিমধ্যে রাউজান থানার ১৩নং নোয়াপাড়া ইউনিয়নের পথের হাটের নিকট আওয়ামী লীগ কর্মি মোহাম্মদ হানিফের বাড়ি আক্রমন করেন এবং হানিফকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করেন। চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের পাশে পথের হাটে নোয়াপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদক ইজহারুল হক চৌধুরীর পৈতৃক বসতবাড়িটি জ্বালিয়ে দেয় (ইজহারুল হক চৌধুরী বঙ্গবন্ধু সরকারের শ্রম ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরীর মেয়ের জামাতা)। পরবর্তীতে তারা আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে রাউজানের ৯নং পাহাড়তলী ইউনিয়নের কলেজ (বর্তমানে চুয়েট) ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি আবদুর রব এবং জহুর আহমদ চৌধুরীর পুত্র ছাত্রলীগ নেতা সালাউদ্দিন খালেদকে ধরে নিয়ে কাপ্তাই সড়কে নিয়ে আসে। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ধৃত দু'জনকে চিনে ফেলে এবং তাদের হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিলে কাপ্তাই সড়কে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেইটে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সঙ্গীয় সেনাবাহিনী নিয়ে উনসত্তর পাড়া গ্রামে প্রবেশ করে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে এই গ্রাম হতে ১৭০ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে ধরে নিয়ে একটি পুকুর পাড়ে জড়ো করে। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সঙ্গীয় সেনাদলকে জানায়, এরা সবাই মালাউন এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। কাজেই এদের হত্যা করা হয়। এ জঘন্যতম হত্যাকান্ড হতে অলৌকিকভাবে মাত্র দুটি শিশু বেঁচে যায়। যারা এখনো সেই ভয়াবহতম হত্যাকান্ডের কথা শুনলে নির্বাক হয়ে পড়ে। এ গণহত্যার দৃশ্য এতই নৃশংস যে, ঘটনাদৃষ্টে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সঙ্গী কুখ্যাত মাইজ্যা মিয়া সেখানে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। ফলে সেদিনের মত হত্যাভিযান বন্ধ করে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তার সঙ্গীয় সেনাদলসহ শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর তৎকালীন গাড়ি চালক আমীর হামজা একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ ঘটনা বিভিন্ন সময় বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনার পর হতেই তিনি গাড়ি চালকের পেশা ত্যাগ করেন।

১৯৭১ সালের মে মাস হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত দীর্ঘ সাত মাস সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী চট্টগ্রাম শহরে গুডস হিলে একটি বেসরকারি জেলখানা ও জল্লাদখানা স্থাপন করেন। প্রতিদিন চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, চিকিৎসা, ঔষধপত্র ইতাদি দিয়ে সহায়তাকারী বলে যাদেরই সন্দেহ করা হত তাদের ধরে এনে গুডস হিলের এ জল্লাদখানায় অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। চট্টগ্রামের সম্মানী ও ধনী ব্যবসায়ীদের ধরে এনে নির্যাতন চালানো হত। প্রচুর অর্থ মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে এদের কাউকে কাউকে রেহাই দেওয়া হত। প্রতদর্শী আলহাজ ফজলুল হক সওদাগর জানিয়েছেন, তিনি এ জল্লাদখানায় দীর্ঘ একমাস বন্দিজীবন যাপনকালে দেখেছেন প্রতিদিনই নিত্য-নতুন কৌশল অবলম্বন করে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী খোকন এবং তৎভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন কাদের নিজ হাতেই অমানুষিকভাবে বন্দিদের প্রহার করত। প্রতিদিনই জল্লাদখানায় দু-একজনকে হত্যা করা হত এবং তাদের লাশ রাতে কার্ফু চলাকালীন সময়ে গাড়িতে করে নিয়ে কর্ণফুলী নদীতে ফেলে দিয়ে আসা হত।

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তার সমস্ত সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে রাউজান থানার ১০নং পূর্ব গুজরা ইউনিয়নে অবস্থিত বৌদ্দ সম্প্রদায়ের পূণ্যস্থান হোঁড়াপাড়া অগ্রাসার বিহার ও বিহার সংলগ্ন অনাথ আশ্রমে হানা দেয়। অগ্রসার বিহার হতে একটি স্বর্ণনির্মিত বৌদ্ধ মূর্তি এবং স্বর্ণাধারে রক্ষিত মহামতি গৌতম বুদ্ধের অস্থি যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি পূণ্যস্মৃতি স্মারক স্বর্ণাধারসহ লুট করে নিয়ে যায়। তার সাঙ্গাপাঙ্গরা কয়েকজন বৌদ্দ অনাথ কিশোরীকে অনাথালয় হতে উঠিয়ে নিয়ে আসে। বিষয়টি পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকারের জন্য বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে। থাইল্যান্ড, জাপান সরকার বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফলে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সাথে তাদের সর্ম্পকে চিড় ধরে। এ সময়ে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নিজেকে বিগ্রেডিয়ার বলে পরিচয় জাহির করতে শুরু করে।

সেপ্টেম্বর -অক্টোবরের দিকে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সন্ত্রাসী তৎপরতা ও নির্মমতা ভয়াবহ আকার ধারণ করলে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় জোনাল কাউন্সিল তার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মুক্তিযুদ্ধে ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলফা গেরিলা গ্রুপকে নির্দেশ প্রদান করেন। অক্টোবর '৭১-এ আলফা গ্রুপের একটি ক্ষুদ্র দল চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা সড়কের এক স্নান এ্যামবুশ করে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর গাড়ির উপর গুলিবর্ষণ করে। এ সময় তিনি মুসলিম লীগ নেতা ডা. সমিউদ্দিনের বাসভবনে একটি নৈশভোজে অংশগ্রহণ করে নিজ আস্তানায় ফিরে যাচ্ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের হামলায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর গাড়ি চালক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় এবং সাকা উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। পরবর্তীকালে চিকিৎসার জন্য তার পিতা তাকে লন্ডনে পাঠান। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে অগণিত অভিযোগ দায়ের করা হতে থাকলে তিনি লন্ডনেই আত্মগাপন করে থাকেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে তিনি খোন্দকার মোশতাকের কৃপায় বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ পান।

'৬৯-'৭০ সনে উত্থাল গণআন্দোলনের ফলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন স্ব-ঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পতন ঘটলে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গন হতেও বিদায় গ্রহণ করেন এবং তার সংগঠন কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতির পদটি পূর্ব পাকিস্তানের ফজলুল কাদের চৌধুরীর হাতে সমর্পণ করন। একই সাথে কনভেনশন মুসলিম লীগের তিন কোটি টাকার তহবিলটিও এককভাবে ফজলুল কাদের চৌধুরীর হস্তগত হয়। এ বিশাল অংকের তহবিলের সিংহভাগই ফজলুল কাদের চৌধুরীর নামে করাচি, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, হাবিব ব্যাংক এবং ইউনাইটেড ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখায় জমা ছিল। '৭১ এর ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের চারদিন আগেই চট্টগ্রামস্থ স্টেট ব্যাংক মারফত প্রায় এক কোটি টাকা পাকিস্তানে স্থানান্তর করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে ফজলুল কাদের চৌধুরীর ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ করা হয়। জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করার পর ১৯৭৭ সালের শেষদিকে এ ফ্রিজ একাউন্টটি অবমুক্ত করে দেন। ফলে ফজলুল কাদের চৌধুরী তনয় সালাউদ্দিন-গিয়াসউদ্দিন একসাথে বিপুল অংকের টাকার মালিক বনে যান।

১৯৭৮ সালের সামরিক সরকার প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করলে তিনি পুনরুজ্জীবিত বাংলাদেশ মুসলিম লীগে যোগদান করে প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করেন। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের প্রচ্ছন্ন ছত্রছায়ায় তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু অচিরেই এ সর্ম্পকে ফাটল ধরে। ৮২ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী গোপনে সামরিক শাসক হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে গোপন সর্ম্পক স্থাপন করে জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। বস্তুতঃ এরশাদের সামরিক শাসন আসলেই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তার সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীকে সুসংগঠিত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্ত্রের ঝংকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এ সময় তার বিশাল বাহিনী অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ত হন। এরশাদ শাসনামলে ভারতীয় উলফা গেরিলাদের অস্ত্র গোলাবারুদ যোগানের কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। ১৮৮৬ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং তার সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে চট্টগ্রামের রাউজান-রাঙ্গুনিয়া-হাটহাজারী-ফটিকছড়ি এলাকায় প্রায় দেড় শতাধিক প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক কর্মী প্রাণ হারায়। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী চট্টগ্রামের একটি মাফিয়া গোষ্ঠীর প্রধান রূপে 'মাফিয়া ডন' হিসেবে সারাদেশে খ্যাতি (?) অর্জন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলে নতুন চন্দ্র সিংহের পুত্র পরিবার পরিজন দেশে ফিরে আসেন এবং '৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি নতুন চন্দ্র সিংহের মেজ পুত্র সত্যরঞ্জন সিংহ তার পিতার হত্যাকান্ডের জন্য ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তৎপুত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে প্রধান আসামি করে রাউজান থানায় সাকার বিরুদ্ধে প্রথম একটি মামলা দায়ের করেন। পরবর্তিতে সাকা প্রভাব খাটিয়ে এ মামলার যাবতীয় নথি গায়েব করে বলে জনশ্রুতি আছে। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে খুনী সালাউদ্দিন দেশে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং নিজের অবৈধ প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে মামলাটি হাইকোর্টে নিয়ে যায়। এরপর মামলা আর গতি লাভ করেনি। গত ৮৩ সনে মামলার বাদী সত্যরঞ্জন সিংহ পরলোক গমন করেন। চট্টগ্রামের রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি থানায় ১৯৮৬ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত দশ বছরে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও তার সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অর্ধশতাধিক মামলা দায়ের করা হলেও অর্থবিত্ত ও বৈভব নিয়ে সালাউদ্দিন কাদের গং এই মামলা সমুহের মোকাবেলা করেছেন। বিএনপি সরকার আমলেই তার বিরুদ্ধে একডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে সাকা এখন কারাগারে। বিচার চলছে। চট্টগ্রামবাসী এখন সাকা'র ফাঁসির রায়ের অপেক্ষায়...।

কী অর্জন নিয়ে ঘরে ফিরবে তরুণ প্রজন্ম?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোল্লার ফাঁসি দাবি করে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে যে গণজাগরণ তারা দেখিয়েছে তা ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রামসহ সারাদেশে। চট্টগ্রামের জামালখান প্রেস ক্লাব চত্বর এখন গণজাগরণ মঞ্চ হিসেবেই পরিচিত। এখানে আসছে শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, গৃহিনী, চাকরিজীবিসহ প্রায় সবাই।

কিসের টানে কিসের মোহে এত সমাগম? ভাবলে সত্যিই মাথা ঘুরে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজার হাজার মানুষ এত সুশৃঙ্খল থাকে কিভাবে? কোথায় পেল এই শিক্ষা তারা? না, কোনো শিক্ষা নেই। শুধুই ভালোবাসা। দেশপ্রেম আর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। ধাক্কাধাক্কি নেই, স্লোগান নিয়ে নেই বিরোধ। নিরাপত্তার অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বাবা তার সুন্দরী কিশোরী কন্যাকে নিয়ে ভিড় ঠেলে সমাবেশে যোগ দেন। শিল্পপতির সুন্দরী স্ত্রী তার ছেলে সন্তানকে নিয়ে রাতের বেলায় সমাবেশস্থলে যোগ দিয়ে হাত তুলে স্লোগানে সুর মেলাচ্ছেন।

সবই আমরা দেখছি। ভাবনার জগতকে নানাভাবে প্রশ্ন করছি এই আন্দোলনের শেষ কোথায়? কি অর্জন নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাবে? কাদের মোল্লা, নিজামী, সাঈদী ও অন্য যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি কি তাদের একমাত্র চাওয়া?

তরুণ প্রজন্ম সুশৃঙ্খল ও সৃজনশীল আন্দোলনের যে রূপ আমাদের দেখিয়ে দিল তাতে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে আমাদের বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন হবে, ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া হবে, ফুটবলে ব্রাজিল হবে, চলচ্চিত্রে মুম্বাই হবে, শিল্প-সংস্কৃতিতে ফ্রান্স হবে, সৌন্দর্য আর শৃঙ্খলায় সিঙ্গাপুর হবে।

ঢাকার শাহবাগ কিংবা চট্টগ্রামের জামালখান প্রেস ক্লাব চত্বরের আবেগ ও চেতনা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। দূর থেকে ছিটানো খাবার নিয়ে কেউ হৈ হুল্লোড় করবে না। একজনের খাবার তিনজনে ভাগ করে খাবে। এই তরুণ প্রজন্ম তাদের আবেগ, মেধা, সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশকে বানাবে অন্য এক বাংলাদেশ। আমরা সেই স্বপ্ন পূরণের আশায় রইলাম।

অসামান্য এক সামাজিক যুদ্ধ

কলিম সরওয়ার

বার্তা সম্পাদক, দৈনিক পূর্বকোণ

আমি একাত্তরের শিশু। ৬ বছর বয়সে যুদ্ধ মনে নেই। পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের নৃশংসতা দেখিনি। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের গর্বিত যোদ্ধাদের অসম সাহসিকতার যুদ্ধের কোনো স্মৃতিও নেই। ঝাপসা, অল্প যা আছে তাতে বীরত্বগাথা বলার বা লেখার মতো কোনো উল্লেখযোগ্য কাহিনী নেই। তবে আমি নব্বই'র গণআন্দোলন দেখেছি, স্বৈরাচারের পতন দেখেছি এবং দেখছি ২০১৩ সালের তারুণ্যের যুদ্ধ।

স্বাধীনতার ৪২ বছর পর এ এক অন্যরকম যুদ্ধ। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া এ 'গণজাগরণ যুদ্ধ' শুরু করা বীররা আমার প্রজন্মের নয়, তারা আমার সন্তানদের প্রজন্মের। ৪২ বছর দূরে থাক, ৪২ দিন আগেও ভাবিনি দেশজুড়ে এমন এক রাজাকারবিরোধী যুদ্ধ শুরু হবে। সার্বক্ষণিক এসএমএস ফেসবুকে ডুবে থাকা এ প্রজন্ম সমস্ত রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যে যুদ্ধ করেছে এটা সশস্ত্র লড়াই নয়, এক অসামান্য সামাজিক যুদ্ধ। বাঙালি জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতি ইতিহাস এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার আপাত সহজ, অথচ অসম্ভব কঠিন এক যুদ্ধ। আমি এ তারুণ্যকে অভিবাদন জানাই। এ তারুণ্যের মাঝে আছে একাত্তরবিরোধীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ক্ষোভ। আছে একাত্তরের চেতনাকে স্থায়ী করার অদম্য অফুরান প্রাণশক্তি। ফলে আস্থার জায়গাটুকু নিশ্চিন্ত মনে এ তারুণ্যের জন্য ছেড়ে দেয়া যাবে। আজ কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন ইউনিপে, শেয়ারবাজার, পদ্মাসেতু ইত্যাদি ইত্যাদি ইস্যুতে কেন এ প্রজন্ম এমন কোনো আন্দোলন শুরু করেনি অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে এরা আবার ঐক্যবদ্ধ কোনো আন্দোলনে নামবে কি না। তারুণ্য চত্বরের প্রতিটি কোণে এসব প্রশ্নের চমৎকার সব উত্তর আমি খুঁজে পাই। বিনীতভাবে জানাতে চাই, এরা ইউনিপে, শেয়ারবাজারে যায়নি, পদ্মাসেতু বিশ্বব্যাংক নিয়ে ভাববার সুযোগ এদের এখনও হয়নি। এরা শুধু ভেবেছে শেকড়ের কথা। এরা জাতির শেকড়কে শুদ্ধভাবে গভীরে প্রোথিত করে প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চায়। আমি বিশ্বাস করি, জাতির প্রতিটি ক্রান্তিকাল এবং প্রতিটি সংকটে এরা বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়াবে। সবার কাছেই অনুরোধ, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আমাদের চেতনার এ 'শিশু যোদ্ধাদের' হত্যা করবেন না। দেশের প্রতিটি ঘরে চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া তারণ্যকে সযতনে লালন করে সজীব করে তোলাই আমার বা আমাদের প্রজন্মের দায়িত্ব।

জয় আসবেই

মহসীন কাজী

যুগ্ম সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

মুক্ত দেশের অবারিত আলো-হাওয়ায় আমার জন্ম। আমি যখন মায়ের গর্ভ ছেড়ে পৃথিবী নামের এই গ্রহে আসি ঠিক তার পাঁচ বছর আগে স্বাধীন হয় আমার দেশ–বাংলাদেশ; আমার মা। একাত্তর দেখিনি আমি। দেখা হয়নি একাত্তরের সেই বীভৎসতা আর নারকীয় বর্বরতা।

এদেশীয় কুলাঙ্গারদের সহযোগিতায় পাক বাহিনী খামচে ধরে আমার মানচিত্র। নয় মাস ধরে চালায় ধ্বংসযজ্ঞ। লাখ লাখ প্রাণ আর মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলার বীরেরা ইস্পাত কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। আমাদের জন্য এনে দেয় সার্বভৌমত্ব। আমি এবং আমরা বেড়ে উঠেছি স্বাধীন দেশের আলো-বাতাসে।

মুক্তিযুদ্ধ না দেখলেও সেদিনের বর্বরতার কথা শুনেছি শৈশবেই। বাবা-মা আর দাদির মুখে ঘুম পাড়ানিয়া গল্পের ছলে আমার শোনা হয়েছে আগুনঝরা সেই দিনের কথা। মা বলেন, বাবা মুক্তিযুদ্ধে থাকতেই মৃত্যু হয় আমার দাদার। পাক বাহিনী আর রাজাকারদের অশুভ শক্তির মুখে অনেক কষ্টে দাদার জানাজা পড়ে আবারও ছুটেন রণাঙ্গনে। তার মাস দুয়েকের মধ্যে জন্ম হয় আমার বড় ভাইয়ের। অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকদিন বাবা তাঁর একমাত্র ছেলের মুখ দেখতে পারেননি। বাবার যুদ্ধে যাওয়ার অপরাধে রাজাকাররা পরপর দুবার আগুন দেয় আমাদের ঘরে। শেষবারের আগুনে ঘরের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। দাদি বলতেন, পাঞ্জাবি (পাক বাহিনী) বা রাজাকার

এরপর পৃষ্ঠা ৬

একটি ফাঁসির অপেক্ষায় চট্টগ্রাম

কাজী আবুল মনসুর

সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

ষাটের দশক। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কুখ্যাত গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খানের সন্ত্রাসী পেটোয়া বাহিনী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুখ্যাত এনএসএফ এর প্রভাবশালী সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী (সাকা)। এ সময়ের ত্রাস 'খোকা পাঁচ পাণ্ডুরের' সহযোগী বিএনপি'র শীর্ষ নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে খোকন নামেই পরিচিত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ,১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্তপাকিস্তানের লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন সময়ে তিনি কুখ্যাত কালাবাদের আমীর এর মাফিয়া চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়ার। সামাজিক সন্ত্রাস সৃষ্টি, খুন, হত্যা, ও সন্ত্রাসবাদ কায়েমের প্রশিক্ষণ রয়েছে। '৬৯-এর গণআন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের শাসক ক্ষমতা হতে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁনের পতন ঘটলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পিতা মরহুম একেএম ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মনোনীত হন। '৭০ এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঘৃণাভরে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করলে পাকিস্তানের পার্লামেন্টারি রাজনীতি হতে অশুভ এ নক্ষত্রের পতন ঘটে। কিন্তু পাঞ্জাবী কোটারী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা রাজনীতির কানাগলিতে ষড়যন্ত্র শুরু করলে '৭১-এর বাংলাদেশের জনগণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। ফলে বাঙালিদের দীর্ঘদিনের মুক্তি সংগ্রাম, সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। '৭০-এর নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণকারী ফজলুল কাদের চৌধুরী পাঞ্জাবী ষড়যন্ত্রকারী সিভিল-আর্মি-বোরোক্রেটদের সাথে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন এবং বাঙালিদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে পদদলিত করার জন্য হীন ও

এরপর পৃষ্ঠা ৭

দ্রোহের আগুনে রাজাকারের শ্মশান

আশরাফ উল্লাহ রুবেল

সহ-সম্পাদক, প্রথম আলো

বসন্ত এলো দ্রোহের গানে। পলাশে আগুন। ভালোবাসা মিশে গেছে রাজপথে। আজ উৎসব নয়, ভালোবাসা নয় প্রতিবাদের ঝাণ্ডা হাতে রাজাকারের গলায় পড়াও ফাঁস। বাঁচাও পতাকা, বাঁচাও স্বদেশ। কণ্ঠে আগুন ঝরা স্লোগান-'তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'রাজাকার নিপাত যাক'। টানা ১০ দিন। তবু ক্লান্তিহীন তারুণ্য রাজপথ আঁকড়ে আছে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে। জেগে আছে চেতনার প্রদীপ হাতে। জেগেছে বাঙালি, নতুন সূর্য পূর্ব দিগন্তে।

প্রেস ক্লাবের ছাতিমতলায় জাগরণের গান 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা', 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে...'। নাওয়া-খাওয়া যেন ভুলেই গেছে তারা। প্রতিবাদে ভোর, রাত জাগা আবার নতুন দিন। মুক্তিযোদ্ধার মনে যুদ্ধদিনের স্মৃতি, তারণ্যের কাছে নতুন মুক্তিযুদ্ধ। যেন 'নেই ভেদাভেদ হেতা কুলি আর মজুরে...'। বারে বারে উচ্চারিত 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'।

কে নেই জনতার কাতারে? বাবা কাঁধে খোকা। মায়ের হাত ধরে ছোট্টমণি। লাঠিতে ভর দিয়ে বৃদ্ধা। মোড়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে স্লোগান শোনে রিকশাওয়ালা। বন্ধুর কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায় তারুণ্য–'ফাঁসি ফাঁসি চাই, রাজাকারের ফাঁসি চাই'। জাগ্রত জনতা নিয়েছে বিজয় শপথ। জিতেই ফিরব ঘরে। জেগে আছি বন্ধুরা, শাহবাগে জামালখান। দ্রোহের আগুনে হবে রাজাকারের শ্মশান।

সম্পাদক আলমগীর সবুজ

সম্পাদনা পরিষদ রাশেদ রউফ, কাজী আবুল মনসুর, মহসিন চৌধুরী, মহসীন কাজী, শুকলাল দাশ এবং নূর মোহাম্মদ রফিক

শিল্প নির্দেশনা হোসাইন তৌফিক ইফতিখার

ছবি সৌজন্য মোস্তাফিজুর রহমান, জোবাইর হোসাইন সিকদার, নিপুল কুমার, রাজেশ চক্রবর্তী, হেলাল সিকদার ও কমল রুদ্র

প্রকাশনা চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০১৩-১৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত